



# উপহার ।

—•—

অসেচনক

ত্রীমুখ্ত বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, এম্, এ, বি, এল্,  
ভূগলি জজ আদালতের উকীল  
মহোদয় প্রাণপ্রতিমেষু।

অভিন্ন হৃদয়,—

আপনার অসমসাহসী বন্ধু গ্রন্থখানি মুদ্রাক্ষিত করিয়াছে,  
আপনি আমাকে যেকপ ভাল বাসেন, তাহা স্মরণ করিয়া  
এই গ্রন্থ আপনাকে উপহার দিলাম, আজ হয়তো ভাবিবেন,  
ভালবাসা অপাত্রে ন্যস্ত হইয়াছে।

প্রিয়তম!—যে হস্ত “সারওয়াল্টারস্কট” প্রভৃতি মহাআ-  
গণের লেখনি সম্ভূত-রত্নে সুশোভিত, আজ সেই হস্তে আমার  
এই পাগলামি!—অনুরোধে—স্নেহে—অবকাশে একবার  
আত্মোপাস্ত পাঠ করিবেন,—আশা !!

সুরুদ্বর,—মনে ভাবিয়াছি এখানি নবোপাখ্যান, প্রায়ই  
দেখিতে পাই,—আখ্যায়িকা লেখকেরা স্বীয় গ্রন্থ কাহাকেও  
না কাহাকে উপহৃত দেন, আমারও সেই অনুষ্ঠান! (অনু-  
ষ্ঠানের ক্রটি নাই!) কিন্তু কাহার নাম কলঙ্কিত করিব?  
কাহাকে সম্বর্ষ করিতে গিয়া ক্রোধ উদ্বীপিত করিব? ভাবিয়া  
আপনাকেই উপহার দিলাম, আপনি যদি ইহা পাঠ করিয়া  
কিছু মাত্র আহলাদিত হয়েন, পরম সম্বর্ষ হইব, নচেৎ  
তিরস্কার ভো করিবেনই না, এই ভরসা!

(মনে জানি) আপনারই

আমি।

## ভূমিকা ।

—০—

“যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোহত্র দোষঃ ।”

মানসিক বৃত্তি বয়সের সহিত পরিবর্তিত হয়,—একথা যিনি বিশ্বাস না করেন,—করুন, আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস; কারণ আমি ভুক্তভোগী! এই গ্রন্থখানি যখন লিখি,—তখন এক এক দিন ভাবিতাম,—কালে আমিও একজন আখ্যায়িকা-লেখক হইব,—আর এখন স্থির সিদ্ধান্ত, এ আমার পাগলামি! যখন যিনি যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাঁহারই তখন মনে কিয়ৎ পরি-মান সাহসও দীর্ঘ আশা হয়, এ কথা শুনিলে আন্তরিক ভাবে গোপনকারী অনেক প্রকার বলিবেন,—“সে তোমার ন্যায় নির্লজ্জের হইতে পারে, আমাদের ভো নহে, তাহা হইলে আমরা সত্যি ভূমিকা লিখিতাম না!”—কিন্তু আমার অন্তর মুক্তকণ্ঠে বলিবে সে কথা! তাঁহার আন্তরিক নহে, তাহা হইলে গৃহের অর্থ নষ্ট করিয়া পরিশ্রমে কাতর না হইয়া সাধারণে প্রকাশ কেন? আমিও যখন গ্রন্থ লিখি, তখন (মনের কথা বলিতে কি) একটু সাহস ছিল, সেই সাহস থাকিতে থাকিতেই এই গ্রন্থখানির প্রথম কয়েক পরিচ্ছেদ অম্পায়ুস্বতী” “বাঁচরা-পাড়া প্রকাশিকা” নাম্নী মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করি, কিন্তু এখন আর সে ভাব নাই, এখন নিশ্চয় জানি,—এটি আমার পাগলামি! তথাপি এ ছঃসাহস কেন? আমার কতকগুলি বন্ধু গ্রন্থখানি দেখিয়া বারবার মুদ্রাস্থিত করিতে অনুরোধ করিয়া-

ছেন,—কেবল সেই অনুরোধের বশবর্তী হইয়াই গ্রন্থখানি সাধারণে প্রকাশ করিলাম,—লাভ,—পাগলামি-প্রকাশ! যদি কেহ বলেন, “গ্রন্থকারের বন্ধুগুলিরই বা কি রুচি?”—আমি মুক্তকণ্ঠে বলিব, তিনি বন্ধুর বন্ধুত্বে কখনই বন্ধ হন নাই, যিনি বন্ধুত্ব কখন করিয়াছেন,—তিনি বলিবেন না, কারণ বন্ধুর মন্দ কি বন্ধুতে বিচার করিতে পারে? তাহাতেত বাতুলের বন্ধু, ~~কৃতবান্ধই~~—সহৃদয় না হইলে কি বন্ধুত্ব হয়! আর যিনি সহৃদয় নহে,—তিনি অকৃত্রিম বন্ধুও নয়,—কপট বন্ধু—হয়তো উদ্বেজিত করিতেছেন।

এখানি কি?—তাহা সাধারণের বিচার স্থল,—আমি কতকটা আখ্যায়িকার অনুরূপ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, যদি চ বাঙ্গলা ভাষায় এখনও রীতি দৃঢ় মূলা হয় নাই, তথাপি বাঙ্গলা আখ্যায়িকা লেখক পথ-দর্শক মহানুভবেরা এক এক খানি ইংরাজী গ্রন্থের ছায়া লইয়া ইতিহাসের একদেশের নহিত যোজনা করিয়াছেন,—আমারও তাহাদিগের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন তবে লিখিবার কালীন ঐতিহাসিক ঘটনা লক্ষ্য অঙ্গ, নিজেও নিতান্ত অপটু!

এখানি আমার গ্রন্থের প্রথম খণ্ড! অনেকেই এ কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিবেন,—লেখকের ধন্য আশা! আবার দ্বিতীয় খণ্ড বাহির করিবার ইচ্ছা আছে! কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা,—জগতে চুরাশা কাহার নাই?—যে সে আশা প্রকাশ করে সেই বাতুল,—আমিও তো বাতুল! তথাপি দ্বিতীয় খণ্ডের উল্লেখের অধুনা প্রয়োজন? এখন অনেকে পুস্তক খানি পাঠ করিয়া মনে মনে বলিবেন,—গ্রন্থকার যদি নায়িকার নামে গ্রন্থ লিখিবার মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে কুসুমিকার নামে গ্রন্থের নাম না রাখিয়া বরং এলাহি-



আমি নাম রাখিলে কতক সঙ্গত হইত!—এও কি আমার পাগ-  
লামী?—না—যখন গ্রন্থ লিখি, তখনতো পাগলামী দেখা-  
ইতে ইচ্ছুক হিলাম না!—তবে কি বানভট্টের কাদম্বরী  
দৃষ্টান্ত দেখাইব,—তিনি বরং মহাশ্বের নামে গ্রন্থের নাম  
রাখিতে পারিতেন,—কাদম্বরী নাম রাখিলেন কেন? সে  
দৃষ্টান্ত দেখাইতে চাহি না, বড় লোকের কথায় আমাদের  
কথা,—এও তো পাগলামী!—তবে গ্রন্থের নাম কুসুমিকা  
কেন?—বস্তুতঃই কুসুমিকার প্রণয়ের মধুর ছবিই আমার  
গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য!—প্রথম খণ্ডে যে সকল নায়ক নায়িকার  
ছায়া মাত্র আছে, দ্বিতীয় খণ্ডে তাহাদিগের অনেক ঘটনা  
প্রকাশ! তৃতীয়ই দ্বিতীয় খণ্ডের উল্লেখ!—এ ভূমিকারও  
সেই প্রধান উদ্দেশ্য!

সাধারণে আমি একজন আখ্যায়িকা লেখক বলিয়া পরি-  
চিত হইব,—সে আশা নাই,—কেবল আমার এ পাগলামী!  
আজ এই পর্যন্ত, যদি আবার কখন দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ  
করিতে পারি,—দেখা দিব, আবার সাধারণকে আলাতন  
করিব!—আজ বিদায় ইতি।

কাঁচরা পাড়া।

২৯শে অগ্রহায়ণ ১২৮৫ বঙ্গাব্দ।

আমি—গ্রন্থকার—

সুতরাং—বাতুল।

পড়ে দেখুন

আমার পাগলাগি !!!

# কুসুমিকা ।



অবতরণ ।

‘চলক’ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

উন্নতির অবনতিই প্রবলশক্তি, যেখানে উন্নতি দেবীর আহ্বানদায়িনী মূর্তি, সেইখানেই নিষ্ঠুরা অবনতি রাক্ষসীর ভীষণ দৃষ্টি ! যে অট্টালিকায় আজ বনজন পরিবৃত্তি উন্নতি দেবীর ছায়া, কখন না কখন দেখিবেন, অবনতি রাক্ষসীর করালগ্রাসে সেই প্রাসাদ ভগ্ন, জ্যোতিঃহীন, অশ্বখ-বট-প্রভৃতি বৃক্ষের উৎকর্ষ ক্ষেত্র ! সেই অবনতি রাক্ষসীর ছায়াই অর্গ্য জাতিতে দান-শঙ্ক দাগী করিগাছে । মনঃমানসিগের জয় পতাকা যখন ভারতবর্ষের সমগ্র উত্তীর্ণ হইতেছিল, দিল্লীর রাজপ্রাসাদ যখন ভারতবর্ষের সার হইয়াছিল, দিল্লীশ্বরকে জগদীশ্বর বলিতে ও যখন লোক কুণ্ঠিত হইত না, সেই সময় হইতেই অবনতি রাক্ষসী আক্রমণের চেষ্টা করে, কিন্তু উন্নতি দেবীর বিমল-জ্যোতিঃ সন্দর্শনে অগ্রসর হইতে পারে নাই ! পবিত্র পুণ্যই উন্নতি দেবীর প্রবল সেনাপতি ! ক্রমশঃ যবনদিগের অন্তর হইতে পুণ্যের ছায়া লোপ পাইতে লাগিল, আর সম্রাট আকবরের

) ক )

আর ধর্ম মূর্তি দিল্লীর সিংহাসনে নাই ! পুরুষ পরম্পরা হই-  
তেই ক্রমশঃ মুসলমান দিগের প্রভাব হীন হইয়াছে ! স্বার্থপর  
জাত্যভাব বিরোধী পাপ-মূর্তি নরাদম-গণ সিংহাসন কলঙ্কিত  
করিতেছে ! পিতার পুত্রকে, স্বামীর পত্নীকে, পুত্রের পিতাকে,  
ভ্রাতার ভ্রাতাকে, বন্ধুর বন্ধুকে, পরস্পর কাহার ও কাহাকে  
বিশ্বাস নাই ! ক্রমশঃ গৃহ বিচ্ছেদ ! আরেঞ্জিবের সময় হই-  
তেই যবন-রাজলক্ষী চঞ্চলা ! অবনতি রাক্ষসী সেই দিন  
হইতেই দিল্লীর রাজ ভবনে আশ্রয় লইয়াছে ! ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দ,  
যখন দিল্লীর সিংহাসনে দ্বিতীয় আলমগির নাম মাত্র সম্রাট.  
যখন রোহিলারা, জাতবংশীয়েরা ও মহারাক্ষী বেরা স্বাধীন  
হইবার জন্য উত্তেজিত হইয়াছিল, সেই সময়ের ঘটনা লক্ষ্য  
করিয়া আমাদের এই আখ্যায়িকা ।

## কুতুমিকা ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

সংবাদ । ——— এই কি আমার শেষ প্রণয় !

“কৃত্যয়ো ভিন্নদেশস্থাদ্বেধী ভবতি মে মনঃ ।

পুরুঃ প্রতিহতং শৈলৈঃ স্রোতঃ স্রোতোবহাং যথা ॥”

কল্পনাময়ী প্রাচীন কবি-লেখনীই অধুনা বঙ্গ কবিকুলের  
প্রধান সহচারিণী । দেশাচার প্রথার কুসংস্কারে আবদ্ধ ও  
সাহসহীন বঙ্গ সম্ভ্রামগণ আর যে প্রকৃতির বিমলছবি সন্দর্শন  
করিয়া তাহা চিত্র করিতে যত্নবান হইবে সে আশা নাই ।

কয়েকজন বক্ষ সন্তান নিলোন্নিমালি-জলধি-বেষ্টিত নানা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বক্ষ বিরাজিত দ্বীপ সন্দর্শন করিয়াছেন ? যিনি হিন্দু ধর্ম রক্ষায় যত্ববান তাঁহারই সে দর্শন একান্ত দুর্লভ । কিন্তু নব-বস্ত্র-সন্দর্শন-লিপ্সু-মনের নিরন্তর তাহা দেখিতে ইচ্ছা হয় ।

আমুন পাঠক, আমাদের সঙ্গে আসুন, একবার আরব সাগরের নিকট জইয়া যাই ! কি পাঠক, আপনি যে তাহাতে নিরন্তর হইয়া রহিলেন ? সমুদ্র যাত্রায় জাতিপাতাশয় আপনাকে নিবারণ করিতেছে ! আর আপনার যে আশঙ্কা নাই, আপনার দলে অনেক লোক হইবে, আর কিছুদিন পরে আপনারই দল পুষ্ট হইবে । ঐ দেখুন আরব সাগরের সুবর্ণ দুর্গ দ্বীপটি কি রমণীয় ! (এখন যদি ও ঐ দ্বীপটি অবনতি রক্ষণীর করাল গ্রাসে পতিত, কিন্তু তৎকালে ঐ দ্বীপ উন্নতি দেবীর মোহিনী ছায়ার উদ্ভাসিত) । নিবিড়-নীল-নীরদ-নিভ উত্তাণ-ভরজ সুশোভিত লবঙ্গাঙ্গ রাশি পরিখার ন্যায় চতুর্দিক বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে, সমুদ্র তট বালুঘর, স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্ষ, প্রদোষ উপস্থিত, সূর্যাস্তের অন্ত শিখরের অন্তরাল হইতে স্বকর দ্বারা পাদপের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন । কাঁকে কাঁকে পক্ষিগণ স্বপ্নমীনের প্রত্যাবর্তন হইতেছে ; বাগন্তি-সমীরণ সন্ধ্যাকুসুমের যৌরভ অপহরণ করিয়া যেন ভয়প্রযুক্ত ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিতেছে । চৈত্র মাস গত প্রায় । পাঠক মহাশয় ! এ সময়ে আপনার কি ঐ ক্ষুদ্র পর্বতটির অধিত্যকায় পরিভ্রমণ করিতে অভিলাষ হয় ? দেখুন কি মনোহর ও রমণীয় স্থান, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রান্তবর্ণের স্বচ্ছ-ফটিক-সন্নিভ জল বায়ুযোগে ঈষৎ কম্পিত হইতেছে, অর্কমীর অর্ককলা চন্দ্রমা পূর্বদিকে উদয় হইয়া সূর্য্যোদয়ের

ভীষণ কর শ্রবণে যেন দয়াজ হইয়া প্রজাকুলের রক্ষণোদ্দেশে  
 অমৃতকণা বিতরণ করিতেছেন । বায়ু-সহযোগ-কম্পিত-পল্লব  
 তরুণ যেন তাঁহাকেই অভিবাদন করিতেছে । এখানে পুত্র  
 শোক-সন্তপ্ত । রমণীর কদম্ব সুস্থির হয় । পাঠক মহাশয়,  
 আপনি যদি ভাবুক হয়েন, তবে আপনার এই এক ভ্রমণের  
 স্থল; আপনি যদি চিররোগী হয়েন, তবে এই আপনার স্বাস্থ্য-  
 রক্ষার স্থান; আপনি যদি প্রকৃতির শোভা-সন্দর্শন-লিপ্সু  
 হয়েন, তবে এই আপনার নয়নানন্দপ্রদ বস্তু ! ঐ শুশুন, পার্বত  
 গুহাভ্যন্তরস্থ পশুর ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ গোচর হইতেছে । কেন  
 পাঠক,—আপনার মুখ মলিন হইল ? অক্ষুণ্ণ গদগদস্বরে কি  
 বলিতেছেন ? “ আমি বন্য পশু বিরাজিত রমণীর দ্বীপে যাইব  
 না, ছরস্ত্র প্রাণের ভয় আমাকে বারণ করিতেছে ! ” বঙ্গ  
 সন্তান হইলে এই আপনার মনের ভাব ; আমরা তো এক  
 খনির বটে, আমাদের নিকট আর কতক্ষণ গোপন রাখিবেন ?  
 হা মাতঃ বীর-প্রসূ রত্ন-ভূমি ! আপনার কি বীর প্রসবতা শক্তি  
 একেবারে অন্তহীত হইয়াছে ? আর কি কখন আমরা সাহসের  
 মুখ দেখিব ? আর কি কখন আমরা সমর ক্ষেত্রে অসি ধারণ  
 করিয়া স্বাধীনতা-রত্ন রক্ষা করিব ?

পাঠক মহাশয় ! আপনার মনের ভাব বুঝিয়াছি, এখন  
 আর কাজ নাই, আসুন একবার দ্বীপটির চতুর্দিকে পরিভ্রমণ  
 করি । আপনার ভয় নাই, ও হিংস্র পশুর স্বর নয়, গৃহ-পালিত  
 ভয়ানক কুকুরগণ ধ্বনি করিতেছে, শৈলের প্রতিধ্বনিতেই  
 গভীর মেঘ গর্জনবৎ । এ দ্বীপটি জনপরিপূর্ণ । উপত্যকার  
 মধ্যে একটা শিম্পরাজি বিরাজিত, প্রস্তর বিনির্মিত হর্ম্যা;  
 চারিদিকে সজস্র সৈন্যগণ সতর্কতার সহিত প্রহরীর কার্য  
 সম্পাদন করিতেছে ; আগ্নেয়াস্ত্র সকল চতুর্দিকে সজ্জিত ।

অতি ভয়ানক স্থান, হঠাৎ কাহার সাধ্য প্রবেশ করে। প্রথম দ্বার পার হইলে সম্মুখের সোপান দ্বারা দ্বিতলে যাওয়া যায়, তথায় একটি সুসজ্জিত গৃহে গবাক্ষের সন্নিহিতে গজদন্ত বিন-শ্রিত এক খানি আসনে একটি যুবা পুরুষ হস্তস্থিত বস্তু চিবুকে অর্পণ করিয়া উপবিষ্ট আছেন, মধ্যদেশ হইতে রক্ত বিনির্মিত কোষাচ্ছাদিত অসি ভূতল স্পর্শ করিতেছে।

যুবক কি ভাবিতেছেন?—কে জানে,-বীর পুরুষের নয়ই এক মাত্র চিন্তার বস্তু! ইহারও কি সেই চিন্তা? তাহাই বা কেমন করিয়া বলি! ইহার তো মনে কোন স্থানেই অজয়ের সম্ভাবনা নাই? ঐ দেখুন,-মুখে নিরাশ্বাস চিহ্ন প্রকাশমান? শুনুন অক্ষুট গদগদ স্বরে কিস্কলিতেছেন— “মন, ভূমি এতো ভাবিতেছ কেন? আমি কি চিরকালই প্রিয়ার আন্তরিক কষ্টের কারণ হইব? আমায় কি চিরকালই অসি হস্তে করিয়া সমর ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতে হইবে?”

হঠাৎ সম্মুখের দ্বার খুলিল। একজন সমরবেশধারী সামান্য সৈনিকাপেক্ষ্য উচ্চ পদাভিষিক্ত চিহ্ন-ভূষিত যুবা পুরুষ গৃহ-ভাস্তরে প্রবেশ করিয়া আসনস্থ যুবককে অভিবাদন করিলেন।

“সংবাদ কি?” এই প্রশ্নটি গভীর শব্দে উচ্চারিত হইল, আগন্তুক উত্তর করিলেন—দিল্লীশ্বরের একজন দূতের নিকট হইতে কতক গুলিন পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার দ্বারা সুস্পষ্ট অনুমিত হয়, আমাদের সম্পদ বা বিপদ অতি নিকট, যাহাই হউক, পত্রে যাহা লিপিত আছে সকলই নিবেদন করিতেছি।”

আসনস্থ যুবকের মুখে অঙ্গা ক্রোধের চিহ্ন প্রকাশিত হইল, তিনি সগভীরে বলিলেন—“আর নয়, নিশ্চয় হও—পত্র”—আগন্তুক কুণ্ঠিত ভাবে তাঁহাকে কতকগুলিন পত্র প্রদান করিলেন। যুবক পত্র পাঠ সম্পন্ন করিয়া যেন কিছু উদ্দিগ্ধচেতাঃ

হইলেন, কিন্তু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুণে আগন্তুক ভাষা অণুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারিলেন না! তাঁহার চিবুক পুনরায় ব্যক্তি উপর স্থাপিত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই এক খানি পত্র লিখিয়া আগন্তুককে কহিলেন—“সমর কোথায়”?—“আজ্ঞা-, ভরীতেই আছেন।”—এই উত্তর পাইয়া আগন্তুকের করে লিখিত পত্র খানি সমর্পণ করিয়া বলিলেন—“এই পত্র খানি সমর সিংহের হস্তে দিবে, ও তোমরা স্বস্থ কার্যে নিযুক্ত থাকগে, আমি অদ্য রাত্রেই যাত্রা করিব, আদেশমত সময়ের মধ্যে যেন সকল উদ্যোগ করা থাকে।” আগন্তুক—“আপনিও যাইবেন?” “হঁ। আমি অদ্য রাত্রেই যাত্রা করিব, আমার যুদ্ধ সজ্জা প্রস্তুত রেখ, তোমরা যথাসময়ে বাশিধনি করিও, আর আমার অস্ত্রগুলি পরিষ্কার করিতে অনুমতি করিও, দেখ, যেন যাত্রা কালীন সময়সূচক শব্দ করা হয়—” যুবকের মুখ হইতে এই কয়েকটি কথা নিঃসৃত হইল। আগন্তুক আরো কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু যুবকের মুখ-ভঙ্গি সন্দর্শনে—“যথা অনুমতি” এই কথা বলিয়াই নতশিরে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

যুবক অতি গভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, ও তাঁহার অতি-প্রায় কলে প্রকাশ পাইত। তাঁহার দলস্থ দুর্দমনীয় লোক ও তাঁহার নামে ভয়ে কম্পিত হইত।

পাঠক মহাশয়! ইহার পরিচয় জানিতে কি আপনার অভিলাষ হয়? এক এক জনের প্রকৃতি পরের সহিত আলাপ করিতে বাসনা করে, এক এক জন পরের সহিত আলাপ করিতে অনিচ্ছুক। আপনি যদি দ্বিতীয় প্রকৃতির লোক হয়েন, তবে আপনার পরিচয় জানিবার অভিলাষ না হইতে পারে, কিন্তু এই আখ্যায়িকার সহিত যাহার প্রথমা-

বধি শেষ পর্যন্ত সমস্ত তাহার পরিচর জানা অতি কঠিন, তাহার পরিচর না জানিলে আমাদের সকল পরিশ্রম ব্যথা।

পূর্বকালে এই দ্বীপে মহারাষ্ট্র জাতীয় কতকগুলি বীরের আবাস ছিল, ইনি তাহাদিগের অধীশ্বর। যখন দিল্লীশ্বরের অবস্থা উন্নত ছিল, তখন এ দ্বীপও তাহার অধীনে আসিয়াছিল।—কিন্তু অধুনা দিল্লীশ্বরের হীনাবস্থা দৃষ্টে ইহারা স্বাধীন ভাব অবলম্বন করে, মহারাষ্ট্রীয়েরা সময় পাইলেই স্বাধীন হইতে চেষ্টা করে। বহুকাল হইতেই মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রবে অনেক স্থান উত্তপ্ত, তৎকালে ইহাদিগের উপ-পাতেও অনেক স্থান উচ্ছন্ন যায়। যে সময়ে এমত এক দিনও ছিল না, যে ইহাদিগের দ্বারা কোন না কোন দেশ ব্যতিব্যস্ত না হইত। ইনি সমর-দক্ষতায় শিবাজীর সদৃশ লোক ছিলেন। একপু পুরুষো কি রূপ আকার হয় অনেকেই অনুমান করিতে পারেন বটে; কিন্তু এক এক দীর-পুরুষের অক্ষয় নিতান্ত শান্ত চিহ্ন স্থল, ইহার সে রূপ ছিল না। ইহার গঠন নাতি-দীর্ঘ নাতিখর্ব; বর্ণ গোলাপফুলের সদৃশ বটে, কিন্তু কপোলদেশ নিরন্তর রৌদ্র তাপে ঈষৎ ক্রম্ভাভায় বিভূষিত। তাঁহার মুখের আকৃতি ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্ন ভাব ধারণ করিত। কখন অহঙ্কারের, কখন ক্রোধের, কখন চিন্তার, কখন বা প্রেমের চিহ্ন উপলব্ধি হইত। তিনি অধীনদিগের নিকট এমনি তেজীয়ান ছিলেন, যে তাহার মুখের দিকে কেহই দৃষ্টিপাত করিতে পারিত না। তাঁহার দৃষ্টি উজ্জ্বল ও সঙ্গ, নয়ন সুদীর্ঘ, আরক্ত ও সমবিন্যস্ত পক্ষ-রাজি সুশোভিত। ক্রম্বয় চক্ষুর নিরতিশয় শোভা ব্যঞ্জক, নাসিকা দেখিলে বোধ হয় তদ্বারাই মুখের এত শোভা। কণ বীরবলয় বিভূষিত। মস্তকে উল্লীষ, তাহাতে এক খণ্ড প্রশস্ত



উজ্জল ও বহুমুখ্য হীরক সংস্থাপিত ও এক ছড়া গজমতি ভাবা  
বেষ্টিত। সৌরোচ্চিত বহুমুখ্য সজ্জা। তাঁহার শরীরকে আচ্ছাদন  
করিয়াছিল। অবয়ব অধিক স্থূলও ছিল না, অধিক কৃশও  
ছিল না, কিন্তু কোন স্থানের অস্থি দেখা যায় না। ত্বক্ অকু-  
ক্ষিত, কিন্তু উদরের ত্বক্ কথঞ্চিৎ লোল থাকায় তিনটি বলি  
ও নিরন্তর চিন্তাসক্ত হেতু চক্ষুঃ-কোণস্থ চর্ম্ম কথঞ্চিৎ কুক্ষিত  
ছিল। বাহুদ্বয় আঙ্গানুলম্বিত নয় বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ  
আর দুই অঙ্গুলি দীর্ঘ হইলে আনুস্পর্শ করিত। উরু সুগোল;  
ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে কোন অঙ্গ কোন অঙ্গকে পরাজয়  
করিতে পারে নাই। ইহার নাম রণজয় সিংহ; বয়স ৩০৩১  
বৎসর।

যুবক সেই এক ভাবেই উপবেশন করিয়া আছেন। হঠাৎ  
গবাক্ষে দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন—তাঁহার আচ্ছাবাহক  
অনুচর দ্রুতপদ অস্বারোহণে দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিল। তিনি  
পুনর্বার পত্র কয়েকখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অধো-  
বদন হইয়া সেই যষ্টির উপর চিবুক অর্পণ করিয়া পূর্ব্ণভাব  
ধারণ করিলেন।

তাঁহার মুখে বিষয়, ভয়, সাহস, চিন্তা, ক্রোধ ও ছুঃখ ক্রমান্বয়ে  
ক্রীড়া করিতে লাগিল। “এ পত্র কি যথার্থ বাদী—হইতেও  
পারে, আমার কি ছুঃসাহস! হঠাৎ শত্রু মধ্যে অস্প সংখ্যক  
সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইব!” ক্রমশঃ সবিচ্ছেদে এই কয়েকটি  
কথা উচ্চারণ করিলেন। আবার এক ভাব; মুখে সাহস্কার  
বাহসের চিহ্ন বর্ত্তমান। সগভীরে অক্ষুটস্বরে কি বলিতে  
লাগিলেন—সেই স্বর ক্রমশঃ উচ্চভাব ধারণ করিল।  
“আনিতো চিরকাল বাধা করি—অস্প সৈন্য লইয়া বহু  
সংখ্যক শত্রুর সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতো কতবার

করিয়া অন্নভোগ করিয়াছি, এই সুযোগ, দিল্লীখর চারিদিকে ব্যতিব্যস্ত, এসময় অপেক্ষা আর সুসময় কবে হইবে? এখন সর্বত্রই সমরানল প্রজ্বলিত, আমেদকে জয় করিতে পারিলেই কনকন অধিকার করা যায়, এবং সুবর্ণভূগ চিরকাল স্বাধীন থাকে, এ সময় সাহস না করিলে আর কবে সাহস করিব?—আমার কি ক্ষণ-বিনশ্বর দেহের নাশাশঙ্কা? না!—আমার অনুচরবর্গ কি বিদেশে প্রাণত্যাগ করিবে? তাহারা কি প্রভু বিহীন হইয়া পলাইতেও সমর্থ হইবে না?—এতো অমঙ্গল চিন্তাই বা করি কেন?—যে যুক্তি স্থির করিয়াছি, তাহাতে তো অচিরেও জয়ের সম্ভাবনা।”

যুবকের মুখাবয়ব এমন হইল কেন? তাহার হৃদয়তন্ত্রী কাঁপিতেছে, মুখে নিরাশ্বাস চিহ্ন প্রকাশমান! চক্ষু আক্রন্দনোন্মুখ। একি ভাব,—কে বুঝিবে? যিনি সেই ভূখে কখন নিমগ্ন হইয়াছেন, যিনি সে ভাবের ভাবুক তিনিই যুবকের মনের ভাব সহজে বুঝিতে পারিবেন। এতো সাহসী পুরুষের কেবল সময় চিন্তার এতাব নয়,—যিনি কখন বিদেশে কন্ম করিতে গিয়া প্রাণ-প্রতিমা সহধর্মিণীর সহবাসেচ্ছায় কিছু কাল পরে দেশে আসিয়াই প্রভুর জরিত আহ্বান বাতী পাইয়াছেন, তিনিই এ ভাবের ভাবুক!

“আনি কি সময় চিন্তায় এতো কাতর? না—প্রিয়তমার মুখের কমনীয় কান্তিই আমার ক্লেশের কারণ। মন,—সমুদ্র যাত্রাপেক্ষা প্রিয়ার সহবাসই কি তোমার অভিনত? আমি অনুচরবর্গের রক্ষার নিমিত্ত যত্নবান্ হইব না?—অবশ্যই হইব। কিন্তু প্রিয়ার নিকট বিদায় লইয়া আসা উচিত, হয় তো এই বিদায়ই আমার শেষ বিদায়! মনে ছিল—এক্ষণে স্বয়ং যুক্ত যাত্রা না করিয়া কিছু দিন প্রিয়ার অভিলষিত

ক'র্য্য সম্পন্ন করি। সময় এক্ষণে ভালার প্রতিবন্ধক। আর অধিক বিলম্ব করা উচিত নয়, একবার প্রিয়তার নিকটে যাই।”

যুবক উঠিলেন, ও খীম কক্ষস্থ তরবারির প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—“অগি,—তুমিই আমার পরম মিত্র,—তুমিই আমার পবন শত্রু—যদি আমি তোমার বশীভূত না হইতাম, তবে কি একটু ভোগ করিতে হইত? প্রেমসী এক্ষণে কি ভাবিতেছেন?—কে জানে?—হয় তো আমার আগমন বার্তা শ্রবণে নিরতিশয় আক্লাদিতা আছেন। না—তঁহার ও আমার এক মন; তিনিও আমার স্মার অস্তির”। আর অপেক্ষা করিলেন না, গৃহের দ্বার অতিক্রম করিলেন। শেষে এই কথাটি শুনা গেল—“এই কি আমার শেষ প্রণয়?”

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রণয়সী মিলনে। তবে—বিদায়!

“যামঃ সুন্দরি,—শোকং রথা মা কৃথাঃ।”

প্রণয় সকলের প্রতিই সমান অধিকার করিতে পারে। রণজয়ী সমরশীল পুরুষও প্রণয়ের বশীভূত। যিনি প্রণয়ী, তিনিই প্রণয়ের সখা/মর্ম্ম অবগত আছেন। আমাদের প্রধান নায়ক রণজয় সিংহও সেই প্রণয়ের বশীভূত; মৈনিক পুরুষের কদম পাষণ হইতে কঠিন হইলেও প্রণয় কালীন নবনীতবৎ কোমল হ্রদ ধারণ করে। রণজয় সিংহ পূর্ব গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। দ্বারে দ্বারপালগণ নত মস্তকে দণ্ডায়মান হইল। একটী সুসজ্জিত অশ্বে আরোহণ করিয়া ক্রমশঃ পশ্চিমাধিকের

প্রশস্ত পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন। যদিচ পার্শ্বতীয় পথ সকল অবশ্য, কিন্তু এ পথটি সে ভাল মতে; ইহা প্রশস্ত, পরি-  
কৃত, দ্বিপার্শ্বে পল্লববিশিষ্ট বৃক্ষপংক্তি বিরাজিত ও ক্রমশঃ  
অপেক্ষাকৃত উচ্চ; অনতিদূরেই একটা সুদৃশ্য গঙ্গা সেটি পূর্বটির  
অপেক্ষা সুন্দর এবং পূর্বের ন্যায় প্রহরবেষ্টিত। চারিদিকে  
কুসুমতরু সুশোভিত উপবন। স্থানটি অতি রমণীয়। বাটি টি  
যত নিকটবর্তী হইল, রণজয়ের মুখ ততই স্নান হইতে  
লাগিল। ক্রমশঃ অশ্ব দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে যুবক লক্ষ  
প্রদান করিয়া নিজে অবরোহণ করিলেন; দ্বারস্থ সকলে সম-  
স্ত্রমে উঠিয়া অভিবাদন করিল, যুবক প্রথম প্রশস্ত প্রকোষ্ঠ  
পার হইয়া দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিলেই একটি ককণা-  
রসোদ্দীপক বামা-গীত শুনিয়া দাঁড়াইলেন, বোধ হয় তাঁহার  
গতিরোধ হইল।—গীতটি ক্রমশঃ তাঁহার নিশ্বাসের প্রবলতা  
ও নয়নের সজলতা সম্পাদন করিল। তিনি ক্ষণেক অচলৈর  
ন্যায় থাকিয়া সেই সুললিত গীতকারিণী রমণীর গৃহে প্রবেশ  
করিলেন। কামিনী বহুমূল্য শয্যা- ব্যাপ্ত আসনে উপবেশন  
করিয়া রহিয়াছেন,—কপোলে স্তম্ভ-স্তম্ভ!—বোধ হইতেছিল  
যেন শোক, দুঃখ ও চিন্তা তাঁহাকে এক কালে আশ্রয়  
করিয়াছে! যদিও রমণীর চক্ষু অনবরত অশ্রুপাতে অশ্রু  
আরক্তিম, বদন কলুষিত; কিন্তু ইহাতে কি তাঁহার মুখের  
কমনীয় কান্তির হাস হইয়াছে?

সকল গ্রন্থকর্তাই নায়ক নায়িকা বর্ণনে স্বলেখনীকে পরি-  
শ্রান্ত ও মস্তিষ্কের আলোড়ন করেন; আমরা কি তাঁহাদিগের  
প্রদর্শিত পথ অতিক্রম করিব?—কখনই নহে!—তবে আমা-  
দিগের মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিতে হইবে না, কারণ নায়িকা  
স্বভাব-সুন্দরী!!!

“ ভিন্নরূপচিহ্নলোকঃ ”—সকলেরই রুচি ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু সকল প্রভুর্ভাই স্বনায়িকাকে অগতমনোহারিণী করিবার চেষ্টা। পান, তাহাতে কৃতকার্য হন কি না হন, তাহা উক্ত কবিতাংশে প্রকাশ পাইছেছে, সুতরাং আমাদের নায়িকার মন্দ গঠন ভাঙ্গিয়া ভাল করিতে চাহি না, যথার্থের প্রতিই লক্ষ্য।—তাহাতে যাহার মনোহারিণী হন,—বা না হন!

রমণীটির বর্ণ ছুধে—আলতার ন্যায়, কিন্তু সকল স্থল এক রূপ নয়—কপোল, করতল, পদতল, ও অধরৌষ্ঠ প্রভৃতিই তাহার প্রমাণ। ইহা সামান্য দৃষ্টিতেই অনুগিত হইবে, তাহার সর্বাঙ্গাপেক্ষা কপোল প্রভৃতিতে অলঙ্কারের অংশ অনেক অধিক। ছিকপোলে কতকগুলি কুন্তল অযত্নে সংস্থাপিত। নয়ন আকর্ষণ নয় বটে, কিন্তু আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা বাহাকে “পটোলচেরা” বলিয়া প্রশংসা করে তদপেক্ষা অনেক প্রশস্ত; নয়নের অভ্যন্তরস্থ শিরা সমূহ আরক্তবর্ণ, পঙ্করাজি সমবিন্যস্ত ও ক্লমবর্ণ; ক্রদ্বয় অতি প্রশংসনীয়। ধনুরসোদর, কিন্তু মধ্যস্থল মিলিত নয়; দৃষ্টি সরলতা ব্যতীত; নাসিকা বিলক্ষণ “টিকল” বলিলেই বর্ণের শেষ হয়, কিন্তু এক এক “টিকল” নাকে, যে রূপ “গাঁইট” থাকে তাহাতে তাহানাই; দন্তপংক্তি মুক্তার অনুরূপ, কিন্তু পরস্পর সমবিন্যস্ত, গজমস্তির অনুরূপ, সামান্য মুক্তাপেক্ষা অনেক বড়! ওষ্ঠাধর নব সহকার পত্রের ন্যায়, বোধ হয় সততই হাসিতেছেন, সর্ক শরীরে ঘোর চিন্তা ও দুঃখ চিহ্ন প্রকাশ পাইলেও ওষ্ঠাধর বিকসিত কোকনদের ন্যায় নয়ন প্রীতিপদ; কুন্তল ক্লমবর্ণ ও সুদীর্ঘ, কবরী বন্ধনে কয়েকটি সুবর্ণ পুষ্প, তাতেই কত শোভা! সকল কাব্যকারেই সুন্দরী রমণীকে ক্ষীণাকী বলেন, কিন্তু আমাদের নায়িকা সে রূপ নন, স্থূলাকী ও নন, গঠন অস্থিমাংস

জড়িত সুগোল, সুফোমল, প্রায় কোন স্থানেরই অস্থি দেখা যায় না। ইহাকে যদি ক্ষীণাক্ষী বলেন,—বলুন; কিন্তু লতার সঙ্গে উপমা দিবেন না। তবে “কুচতরনমিতাক্ষী” বটে। অস্বদেশীয় স্ত্রীরূপে বাহাকে “খোড় খোড়” গঠন বলে, তাই এটি। কটিদেশ অতি ক্ষীণাক্ষীর ন্যায়, কিন্তু নিতম্ব দেখিলে সেটি ভ্রান্তি বোধ হয়; হস্ত পদ যথার্থ “সুডোল”; নাম—কুমুমিকা বয়স ২০-২১ বৎসর, কিন্তু দেখিতে ষোড়শী অপেক্ষাও তুনি নয়ক্ষা।

রণজয় তাঁহার পশ্চাভাগে পট্টার নিকট দাঁড়াইলেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত যুবতীর লক্ষ্য নাই। তিনি পুনরায় একটি গীত গাইলেন, এবার স্বর কিছু অস্পষ্ট, শোক-জড়িত চির-দুঃখ বাস্তব যুবক ক্রমশঃ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত, লক্ষ্য নাই।—“প্রিয়ে” এই সম্বোধনে কুমুমিকার চৈতন্য হইল। তিনি উঠিলেন ও কিছু হইতে জলধারা নির্গত হইতে লাগিল।

রণজয় কহিলেন—“প্রিয়ে, কীদিকেছ?”—তাঁহার গীত-গুলি অতিশয় দুঃখমূচক। “মাথ”—কুমুমিকার রবনা আর নাগতে পারিলনা। ক্ষণেক পরে রণজয়ের মুখে দৃষ্টি-নিষ্কোপ করিয়া একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস জাগ করিলেন। পুনরায় জড়িত হয়ে বলিলেন “মাথ,—আপনার বিরহে আমার হৃদ কোথায়? আপনি কি বিবেচনা করেন আমি সুখী? কেবল গীতে আমার আন্তরিক ভাব প্রকাশ পায়, নচেৎ আমি ধৈর্য্যাবরণে আবরিত হইয়া দুঃখ গোপন করি, আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমার চিরদুঃখ অন্তরে দুঃখের দীপ নিরন্তর আলিতেছে, আপনি কি শাস্তি কি শদার্থ জানিবেন না? দেখুন—আপনার এখানে কোন অভাব নাই, অনায়াসে লৌকিক সুখে কাল যাপন করিতে পারেন, তবে কেন নিরন্তর যুদ্ধে নিযুক্ত থাকেন?

স্বাধীনতা রত্ন রক্ষা করিতে সমর্থ হওয়া বীরপুরুষের কর্তব্য বটে, কিন্তু বৃথা যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া শৃণিবীকে নর-শোণিতে সিদ্ধ করা কখনই কর্তব্য নয়? নাথ,—আমি আপনাকে উপদেশ দিতেছি না, আমার অন্তর এত দিনের পর চিরসহচর বৈধীকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাই আমার আজ শেষ নিবেদন। আমার যেমন কপাল! আপনি আশ্চর্যিক ভাল বাসিলেও অসহ্য বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। যিনি আমার নয়নের অন্তর হইলে কণ্টের সীমা থাকে না, যিনি যাঁতীত আমার অন্য আশ্রয় নাই, তিনি নিরন্তর বুদ্ধ-বিগ্রহে রত!—আপনার হৃদয় পাষণাপেক্ষাও কঠিন! কিন্তু আর যে এই অবলা আপনার বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করিবে ইহা একবারও মনে করিবেন না। নাথ!—”রণজয় আর বলিতে দিলেন না, তিনি মুখাকৃতির বিভিন্ন ভাব, চক্ষুর বহির্গমনোন্মুখ জল কতক গোপন করিয়া অপেক্ষাকৃত অপরিষ্কৃট স্বরে বলিলেন,—

“প্রিয়ে, ইহা নিশ্চয় জানিও আমার অন্তর যেমন শত্রুদর্পের কাতরোক্তি-বিমিশ্রিত পরিত্রাণ প্রার্থনায় অধিকতর নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করে, তেমনি তোমার মলিন বদন দেখিলেই বাধিত হয়। তোমার বিরহে আমার অন্তরে এক নিমেষও সুখোদয় হয় না, আমি কি আমার বশীভূত?—কিন্তু এখন বোধ হইতেছে আর অধিক দিন তোমায় বিচ্ছেদ-ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে না, তুমি সাহস অবলম্বন কর, আমি এক্ষণে কিছু দিনের জন্য বিদায় লইব।”

কুসুমিনী কুলীনা সতী রমণী বহুকাল বিরহকষ্ট সহ্য করিয়া স্বামীর মিলন মাত্র তাঁহার কোলীনা-সুলভ পুরুষবাক্যে যেমন স্তম্ভিত হয়েন, আমাদের কুসুমিকাও সেই বিভায সংবাদে সেই রূপ হইলেন, তাঁহার মুখমণ্ডলে যে একট

উজ্জলতা লক্ষিত হইয়াছিল তাহা অন্তর্হিত হইল, দেহ-  
থরথর কাঁপিয়া উঠিল, স্বীয় প্রাণেশ্বরের হস্ত গ্রহণ করিয়া  
বাম্পাকুলবিষ্কারিত-লোচনে রণজয়ের মুখে দৃষ্টিপাত  
করিলেন, এবং সাতিশয় কষ্টে অশ্রুট, গদগদ স্বরে  
বলিলেন,--“আগি পূর্বেরই বুঝিয়াছি!” রণজয় তাঁহাকে স্বীয়  
ফোড়দেশে বসাইলেন, কুসুমিকার অবশ্য রসনা পুনরায়  
বলিতে লাগিল;--“আমার কপাল অতি-মন্দ, আমার সুখের  
বন্ধ-ছাথে শেষ হয়” তাহার নয়ন অচস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে  
লাগিল, কণ্ঠ বাম্পবেগে বন্ধ হইল ও অনেক কষ্টে বলিলেন,-  
“আচ্ছা, এখনো যুদ্ধতরি সুসজ্জিত হয় নাই, ফলকাল বিগ্রাম  
করণ, আমি জন্মে মত কিছু বলিয়া লই।”

“প্রিয়ে আমার সাহসলাভে বিদায় দেও! তুমি ভীতা হইও  
না, ইহারা প্রথম শত্রু নহে, আমি তুরাঘ ভোমার প্রণয়রত্ন  
বিচ্ছেদে ভোগ করিব। এই শুন, যুদ্ধযাত্রার সময়সূচক শব্দ  
ধ্বনিতছে, তোমাকে এক্ষণে একাকিনী থাকিতে হইবে না,  
তোমার প্রণয়কাজক্ষী স্বামী নিকটে থাকিবেন। বটে, কিন্তু  
নিরন্তর অনুচরবর্গ তোমাকে রক্ষা করবে, তোমার ভূমি  
বাৎসল্য-ভাগিনী-চপলা অনবরত নিকটে থাকিবে, আর  
তোমার সংচরগণ ভিন্ন কভকগুলি বৃদ্ধা রমণী রাখিয়া যাইব,  
ইহারা নিরন্তর নব নব উপন্যাসে তোমার মনোরঞ্জন করিবে।  
‘প্রিয়ে! আমি আর অধিক বিলম্ব করিতে পারি না। কুসুমিকা  
উজ্জলতায় জীবন-বল্লভের গলদেশ বন্ধন করিয়া অনবরত  
অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার জড়স্থভাব-প্রাপ্ত  
রসনা মধো মধো অস্পষ্ট কি শব্দ করিল কেহই বুঝিতে  
পারিল না।

বীরপুরুষের হৃদয়ও প্রণয়ে দ্রবীভূত হয়। বোধ হয় রণজয়



সিংহ আর যুদ্ধে যাইতে পারিলেন না, রণজয় কুসুমিকার মুখে মুখ দিয়া আছেন, কুসুমিকার সকল শরীর অবশ, রণজয়েরও শরীর কতক অবসন্ন! হঠাৎ কামানের শব্দ হইল, এক্ষণে অমরসিংহ সমুদ্র-যান হইতে রণজয় সিংহের আদেশমত সমর জানাইলেন,—পুনরায় বংশীধ্বনি! রণজয় চমকাইয়া উঠিলেন! তিনি যে কি করিতেছেন অতকণে তাঁহার জ্ঞান হইল। কুসুমিকাকে চুম্বন করিয়া দৃঢ়বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। “ক্লময়েশ্বর! এতো অধৈর্য্য হইওনা, বিদায় দাও!” কুসুমিকার বাক্য হৃত হইয়াছে, তাহা মুখ চিহ্নে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল, তিনি কিছু বলিতে ইচ্ছুক, কিন্তু সামর্থ্য হীন। তাঁহার আলুলায়িত কেশগুচ্ছ রণজয়ের হস্তে স্থাপিত। হঠাৎ বোম্ব হয়, প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়াছে, কিন্তু অস্পন্দিতসেও নয়ন বারিধারায় সে সজ্জাহ ছুরবস্ত্রী। পুনরায় রণতরীতে ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্রধ্বনি হইল। রণজয় আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না, তিনি পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিয়া সেই খটায় কুসুমিকাকে শয়ন করাইলেন, একবার তাঁহার মুখাকৃতি দেখিলেন, এবং মনে করিলেন, এই আমার শেষ দেখা!—ক্রমশঃ তাঁহার ক্লম-স্থাপিত কুসুমিকার অবশ হস্ত অপসারণ করিলেন। পুনরায় যুদ্ধ-পোতের ধ্বনি হইল। রণজয় অস্তির হৃদয়ে প্রেয়সীর মুখচুম্বন করিয়া বাষ্প-সেকে তাঁহার নয়ন জল বৃদ্ধি ও কপোল কলঙ্কিত করিয়া অক্ষুট গদগদস্বরে “তবে—বিদায়” এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

# কুসুমিকা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধোৎসোগ। - কুসুম-মালা বিসর্জন।

“অসমাপ্ত জিগীষয়া স্ত্রী চিন্তা কা মনস্বিনঃ ?

অনাক্রম্য জগৎ ক্লমং ন সন্ধ্যাং ভজতে রবিঃ।”

কুসুমিকার এখনো টেচতন্য নাই, নয়ন মৃদু হু হু ও বাষ্পবে-  
গোড়ানিত! হস্ত অবলোকে সংস্থাপিত! কেশ-পাশা-মালা-বাস্ত্র!  
হঠাৎ তাঁহার হস্তদ্বয় উত্তরগামী হইল, বেশ-হস্ত প্রাণেশ্বরগণই  
তাঁহার উদ্দেশ্য; কিন্তু পাষণ হৃদয় রণজয় কোথায়? তাঁহার  
নয়ন উন্মোচিত হইল, দেখিলেন, জাঁদনবল্লভ অধায় নাই।  
তিনি সন্ধ্যা শরীরে উঠিলেন, গগন-নিকটে গেলেন,  
দেখেন - রণজয় বক্র-প্রাণ-জগৎ-অধায় সমুদ্র-পথে ঘাইতেছেন,  
রণজয়ের চক্ষু কুসুমিকার প্রতি পড়িল, তিনি সন্ধ্যা-  
কণ্ঠে ফিরাইলেন - আর দেখিলেন না। কুসুমিকার নিঃস্বাস  
নয়ন রণজয়ের দিকে রহিয়াছে, কিন্তু আর দেখা যায় না।  
রণজয় বক্রপথে চলিলেন। তখন একবার সন্ধ্যা ফিরাইয়া  
ছিল নটে, কিন্তু কুসুমিকা দর্শন ঘটিল না।

রণজয়ের অসামান্য ঔষধ-তার আনন্দের সমক্ষে এক প্রথম  
পরিচয়, তাঁহার সেই মলিন মুখ-গাভীর ভাব পরিণ করিল, মুখে  
উৎসাহ, সাহস প্রভৃতি জ্বীড়া করিতে লাগিল। এইতো  
বীর-পুরুষের চিহ্ন! কে দেখিলে বুঝিবে যে তাঁহার অন্তঃ-  
তর্কসহ বিরহ যাতনায় কাঁচব? তিনি সমুদ্র-যানের নিকটবর্তী  
হইয়া দেখিলেন, সকলই প্রস্তুত। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে  
মস্তকাবনত করিল; তিনিও মন্ত্রতা দেখাইলেন; রণ-ভরাতে  
পৌঁছবার জন্য একখানি ক্ষুদ্র-চরী আরোহণ করিলেন এবং

রণজয়র অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কি লিখিয়া সম্মুখস্থ সমর সিংহকে বলিলেন—“শৈলেশ্বর কোথায়?—আহ্বান কর?” সমর নিকটস্থ দূতকে ইচ্ছিত করিলে সে আশু শৈলেশ্বরকে সঙ্গে করিয়া আসিল। শৈলেশ্বর মস্তকাবনত করিয়া অভিবাদন করিলেন, রণজয় মিত্র ভাবে তাঁহার হস্তে লিখিত অনুমতি পত্র দিলেন, এবং বলিলেন—“শৈলেশ। এই পত্রের মৰ্ম্মাবগত হইয়া যথাকর্তব্য কার্য্য মতকৈ সম্পাদন করিবে, বীর সিংহের রক্ষিত তরী পৌছিবে তাঁহাকে এই পত্র দেখাইবে, এবং আমার আবাসে দ্বিগুণ রক্ষক নিযুক্ত করিবে, যদি বায়ু অনুকূল হয়, তবে আমি তিন দিনমের মধ্যেই পৌছিব,—এই তিন দিন মতক্ৰমের সহিত দ্বীপ রক্ষা করিবে, দেখ যেন মহারাক্ষসীকুলে কলঙ্ক না হয়;—আর সময় নাই, ক্ষুদ্রতরী আরোহণ কর, দ্বীপের রক্ষা কার্য্যে আশু যত্নবান হও।” শৈলেশ্বর মস্তকাবনত করিয়া—“যথা অনুমতি” বাক্যে বিদায় হইলেন।

রণজয় নিকটস্থ পারিষদবর্গকে আগনার রণপরিচ্ছদ আনিতে বলিলেন—অনুজামাত্র সম্মুখে উপস্থিত। যুদ্ধ বেশে আবৃত হইলেন এবং মগধীয়ে বলিলেন—“মব প্রস্তুত?—“আজ্ঞামিত দাস সকলই প্রস্তুত করিয়াছে”—এই কথা সমর সিংহ বলিলে রণজয় তরী চালাইতে আদেশ করিলেন। শেষ বিদায়যুচক ভীষণ আঘেয়াস্ত্রধ্বনি হইল। রণজয় এই সময় একবারে অদৈর্ঘ্য হইবার মত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে ভাব গোপন করিবার জন্য একটি ক্ষুদ্র কুটীরে প্রবেশ করিলেন। বহু কষ্টে ক্ষণকালেই আন্তরিক ভাব গোপন করিয়া সমর সিংহকে আহ্বান করিলেন। সমর সিংহ মস্তকাবনত করিয়া নিকটে উপস্থিত; রণজয় তাঁহার সহিত যুদ্ধ বিষয়ক পরামর্শ

কহিতে লাগিলেন। এদিকে অনুকূল বায়ু সেই অর্ণবপোতকে  
 দ্রুতগামী করিল। সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গমালা বিদারিত  
 করিয়া রজনী প্রভাত হইতে না হইতেই নির্দিষ্ট স্থানে সমর-  
 তরী পৌছিল। রণজয়ের শত্রু আমেদসাহ আরব্য-সাগর—  
 তটস্থ কন্কন নগরে বাস করিতেছিলেন, রণজয় নিশ্চয় জানি-  
 তেন, তাঁহার সৈন্যাপেক্ষা বিপক্ষের সৈন্য সংখ্যায় অধিক,  
 কিন্তু সমরদক্ষতা সাহসপ্রভৃতি তাঁহার সৈন্য বহুগুণে অলঙ্কৃত,  
 তাহাতে তিনি অসমসাহসী, তাঁহার কিছুমাত্র ভয় লক্ষিত হইল  
 না। প্রধান প্রধান সৈনিক গুরুদিকপক্ষে একত্র সমবেত  
 করিয়া যুদ্ধের উপদেশ দিতে লাগিলেন। সকলে তাঁহার  
 পরামর্শে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে তিনি একটি গুপ্ত কুস্তিরে প্রবেশ  
 করিলেন। তখন তাঁহার অন্তর গুনগার একবার প্রণয়নার  
 নিকট ঘাইবার জন্য বাধ্য হইল,—দীর্ঘ নির্দবতার অপেক্ষা  
 করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই—যুদ্ধে প্রণয়না—এই  
 পরস্পর অসদ্ব্যবহার অন্তরে উদ্ভিত হইলে তিনি মর্দক  
 নিঃশ্বাসে বলিলে—“প্রণয়িনি। তুমি মাহাকে আশ্রয় করিয়া  
 ছিলে, সেই নির্ভর আজ তোমায় পরিত্যাগ করিল। যদি  
 কখন রণজয়ী হই, তবেই তোমাকে আবার অন্তরে আনিব,  
 এখন প্রেমময় নিষ্ঠুরাশ্রয়কুসুমমালা-বিন্ধ্যজন।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চপলা। হৃদয় ভুগি কার ?

“————সৈব————

দৃষ্টি ন নন্দয়তি সংস্রবণীয় শোভা,

ইচ্ছা প্রবাসজনিতান্যবলা জনেন

ছাঃখানি নূন মতিমাত্র ছরুদহানি।”

আমাদের কুসুমকোমল। কুসুমিকা কোয়ার?—তিনি কি জীবিত! আছেন? পাঠক মহাশয়! তাঁহাকে যে অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহা কি আপনার নির্দয়তার কার্য্য হয় নাই? আপনার সমক্ষে এক জন রমণী মৃহাপ্রায়া, আপনি অনাস্রাসে রাখিয়া আসিলেন!—একি আপনার কাপুরুষতা নহে?—হাঁ, আমরাগিকেও আপনার সহচর বলিতেছেন? কিন্তু আমরাগিরেই বা দোষ কি, আপনারই বা দোষ কি? হাঁহার কুসুমমাল। তিনি যদি নির্দয়তা করিলেন আমরা আর কি বলিয়া প্রবোধ দিব? এখন চলুন একবার দেখিয়া আসি, সরলা অবলা পতিপ্রাণা কুসুমিকা কিরূপ আছেন!—বীরপত্নী ধৈর্য্যাবরণে মনের ভাব আবরণ করিতে পারিয়াছেন কি না! একে? এই কুসুমিকা? এক দিবসে এ অবস্থা ঘটিয়াছে!—নির্মল প্রেমে কি না হয়? আহা, আলুলাসিত কুন্তল! মুখ সূর্য্যকর-তপ্ত ছিন্ন প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায়। চক্ষু অনবরত জলধারায় উদ্ভাসিত,—আরক্ত—বিস্ফাবিত! পঙ্ক নিম্নে ক্লম-রেখা! হস্তোপরিগণ্ড সংস্থাপিত! এই এক দিনে বোধ হয় কুসুমিকার বয়স প্রৌঢ়াবস্থার পরিণত হইয়াছে! দুই জন মধ্য বয়স্কা রমণী ও এক জন নবীনা কুসুমিকার নিকট উপবেশন করিয়া রহিয়াছে,--ইহারা বোধ হয় পরিচারিকা হইবে!

প্রথমা দ্বিতীয়াকে সম্বোধন করিয়া দুহৃদয়ে বলিলেন,—“জয়াবতি, আমরা আর কি বলিব! সমস্ত দিন রাত গেল, মুখে একটু জলও দিলেন না! এতে আর কি শরীর বয়? তা ভাই এতোকি ভ্রাজ? কত লোকের স্বামী যে চিরকাল বিদেশে থাকে, বৎসরান্তে একবার আসে তো ঢের! তারাও কি এই রকম করে?” দ্বিতীয়া তদুত্তরে বলিলেন, “দ্বিদি, দেখে শুনে অবাক হইয়াছি, আমিতো ভাই বাপের পুরুষেও কখন এমন শুনিনি!”

কুসুমিকা বিরক্ত স্বরে বলিলেন,—“তোমরা এখনও যাও।”  
তাহারা বলিল—“বলি উঠবেন না, থাকবেনও না?”—“এখনও  
বিলম্ব আছে,” এই উত্তর শুনিয়া পুনরায় সন্নিহিত স্বরে বলিল,  
“এমনি করে কি শরীরটা চমট কর্বেন! আর কি বেলা আছে?—  
কালথেকেতো মুখে জল দিলেন না!”—“এখন তোমরা যাও।”  
পুনরায় সেই বিরক্ত স্বরে কুসুমিকার এই কথা শুনিয়া দ্বিরাঙ্কিত  
না করিয়া তাহারা চলিয়া যায়, কুসুমিকা তৃতীয়াটির দিকে  
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—“চপলা, তুমি বন।”

পাঠক মহাশয়, মনে রাখিবেন, তৃতীয়াটির নাম চপলা।  
চপলার সহিত আপনাদিগের অনেকবার সাক্ষাত হইবার  
সম্ভব,—রণজয় উদারই নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। চপলা  
এক জন মঙ্গরাষ্ট্রীয় প্রধান লোকের কন্যা, বাঙ্গা কালে  
তাহার পিতা মাতার পরলোক প্রাপ্তি হওয়ায় রণজয় পালন  
করেন, কুসুমিকা তাহাকে সোদরা ভগ্নীর ন্যায় জ্ঞান করিতেন,  
চপলাও নিরন্তর কুসুমিকার নিকট থাকিত। চপলা অতি  
সুসমীক্ষা! তাহার স্বভাব নিরন্তর কৌতুক প্রিয়। যদি এই  
ভ্রূণের সময়ে চপলার সহিত সাক্ষাত না হইত, তবে চপলার  
কথা শুনিয়া কত সম্ভব হইতেন। আমাদের কপাল, সুসময়ে  
সাক্ষাৎ করাইতে পারিলাম না, আপনাদেরও কপাল! চপলা  
অতি চঞ্চলা, যদি চপলার রূপ শুনিতে চাহেন,—শুনুন।  
চপলার মূর্তি দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। আপনি যদি  
আপনার স্ত্রীকে ভালবাসেন, তবে ইহা মনে করিলেই যথেষ্ট  
হইবে, চপলা আপনার স্ত্রীর ন্যায়সুন্দরী!—কিন্তু সে কথা  
আমরা বলিতে পারি না, কারণ আপনার স্ত্রী যদি কুৎসিতা  
হয়েন, আমাদের চপলা তো সে রূপ নহেন, কেন না কুৎসিতা  
স্ত্রী যেমন আপনার নয়নানন্দদায়িনী, তেমতি অন্যের ঘৃণা

ভাগিনী, আর আমাদের চপলা আমাদের বিজ্ঞানে সকলেরই মনোহারিণী! একবার আমাদের সঙ্গে আসুন চপলার রূপ খানি দেখাই।

চপলা সুন্দরী!—পরমাসুন্দরী নয়, কোমল—কমল-নিভ-বর্ণ নয়, উদ্যোক্তা। কিছু মলিন, সচরাচর বাহাকে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলে! কিন্তু বর্ণ স্নেহ মাখান! গঠন সুকোমল, এক-হারার অপেক্ষা কিছু স্থূল, সকল অস্থিই মাংসাচ্ছাদিত, মুগ-খানি সতত হাঁসি হাঁসি! অধোরৌষ্ঠ পাতলা, রক্তবর্ণ—জ্বালাতনই যেন রক্তবর্ণে রঞ্জিত : কপোলটি পূরন্ম, কিন্তু “টেবোংগালি” নয়! চক্ষুচুটি সচঞ্চল—সুদীর্ঘ! দৃষ্টি কামরনোদীপকও সতৃষ্ণ, চক্ষুর মধ্যস্থ শিরা সমূহ আরক্ত! জ্ব যেন চিত্র করা, পল্লব দুখানি স্থূল পদ্মরাজি সমবিনাস্ত—সতত অস্থির! নাসিকা মুখের মানান সই—ক্রমোন্নত—টিকল, অথচ বোধ হয় অস্থি-শূন্য, মাঝখানে একটি নলক!—হেল্ছে,—ভুল্ছে,—মুখের শোভা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত কর্ছে!—কপোল ক্ষুদ্রায়তন!—দীর্ঘকেশ পদ গুল্ফ-স্পর্শী, ঘনরুম্ববর্ণ! বর্ণ ক্ষুদ্র,—অবতংশ ভরে ঈষৎ-নমিত! গ্রীবা সুগোল—ক্রমশঃ স্থূল! স্তন দুটি যে “মনি-মেকের” মত উচ্চ, তা নয়!—এখনও সম্পূর্ণ বর্দ্ধিত হয় নাই বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ বর্দ্ধিত হইলে বোধ হয় নাসিকার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াই ক্ষান্ত হইবে,—ক্রমোন্নত, সুকঠিন,—এই খানেই বিধাতা আর কোমলতা রক্ষা করিতে পারেন নাই, তন্নিম্নে তিনটি রেখা; কটদেশ অতি ক্ষীণ, তা বলে যে বোল্তার-ন্যায়, তা নয়! নিতম্ব স্থূলাঙ্গিনীর ন্যায়, বোধ হয় বিধাতা গঠিবার সময় যা মূর্ত্তিকা শেষ ছিল সকল গুলিই নিতম্বে রেখেছেন! অঙ্গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র,—ইহু পদ প্রকৃত সুন্দরীর ন্যায় বলিলেই বর্ণন শেষ হয়! প্রিয় পাঠক, দেখুন দেখি,

এ মূর্তিখানি মনোমত হয় কি না! বর্ণ কোমল-কমল-নিভ নয় বালিয়া যদি মনোমত না হয়, তবে আমরা নাচার, কিন্তু যদি আপনি ভাবুক হন,—একবার হৃদয়ে কম্পনার সহযোগে এই মূর্তিখানি চিত্র করুন: দেখুন, আপনার চিত্রপট হইতে অন্তর হয়—কি—না।

চপলা কুসুমিকার নিকট উপবেশন করিলেন। কুসুমিকা চপলাকে সম্বোধন করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস আগ কাহ্ন বলিলেন, “চপলে, আমি অনেক কাল হতে কষ্ট পাচ্ছি বটে, কিন্তু আমার মন একপা কখন হয় নাহি।” চপলা বলিলেন, “দিদি, জীলোকের অতো অবৈরা হওয়া ভাল নয়, তাকে তিনি তো বোলে গিয়েছেন, এবার তিন দিনের মধ্যেই আসবেন।” “বটে, কিন্তু আমার মন, নিয়তই অমজলাশয়্য। কাছে” কুসুমিকার মুখে এই কথা শুনে চপলা সর্বমমে বলিলেন,—“দিদি, মোকের স্বভাবই এই নিরন্তর আত্মীয়ের অনন্তর আশঙ্কা করে। দিদি, বেলা যায়, এখনও আপনি আসার করিলেন না। এতে শরীর থাকবে কেন?” কুসুমিকা তত্বত্বের কহিলেন,—“চপলে, আর আমার এ শরীরে কান কি? যদি চিত্রকর্মেই একপা বিরহ যাতনা সহ্য কর্ত্তে হল, যদি তিনি এমনবেলে আমাকে ভালবাসা দেখাতে না পারেন, তবে আর নাচার সুখ কি? চপলে,—বলতে কি, আমি তোমায় ভগ্না ও প্রাণহারা সখীর লায় জ্ঞান করি, তোমার কাছে বৈ তন্য কারও কাছে মনের কথা বলিনে;—এই দেখ আমার জীবনের শেষ উপস্থিত।” চপলা কল্পনায় বলিলেন,—“ছি, এমন কথা কি মুখে আনতে আছে? আমি এক বার শৈলেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করে আসি, তাঁকে কি বলে গিয়েছেন।” কুসুমিকা বলিলেন



“তাই গিয়ে জিজ্ঞাসা করে শীঘ্র এস।” চপলা “তবে ঘাই”  
বলে চলে গেলেন।

কুসুমিকা অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে একবার শযায়  
শয়ন করিলেন, পুনরায় উঠে একখানি পুস্তক হস্তে করিয়া  
একটি পাতা উল্টাইলেন, এখানে কাদম্বরী, অজস্র চক্ষুধারায়  
দৃষ্ট আচ্ছন্ন। সেই অশ্রুধারি পুস্তকের পত্র আর্দ্র করিল।  
তিনি পুস্তকখানি রাখিয়া,—“কাদম্বরী,—তোমারই প্রণয়।”  
বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ  
থাকিয়া শোক-গান্ধারী-বাম্প-রোধি-কণ্ঠে বলিলেন,—  
“যে তোমায় কিছু মাত্র স্নেহ কর্লে না, যে তোমার দুঃখের  
কারণ, তারই জন্য এত! হৃদয়—তুমি কার?”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তুমি কার?—তবে আসি।

“তব হৃদয় সাভিলাষং সম্প্রতি সন্দেহ-নির্গমোক্তাতঃ,  
আশঙ্কসে যদাশ্রিতং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নং।”

কুসুমিকার প্রাসাদ হইতে শৈলেশ্বরের আবাস বাটী অধিক  
দূর নয়, এক বাটী বলিলেও বলা যায়, কিন্তু উভয় বাটী  
পরস্পর বিতাগীকৃত। অদ্য যে বাটীতে শৈলেশ্বর আছেন  
সেটি তাঁহার নিজ বাটী নয়,—রাজস্বের আরামগৃহ। আজ  
শৈলেশ্বরই তাহার অধিকারী। গৃহটির চতুর্পার্শ্ব সুদৃশ্য সুগন্ধি  
কুসুমবৃক্ষ বিরাজিত, মধ্যে মধ্যে দেবদারু বৃক্ষ, মধ্যে মধ্যে  
লতাকুণ্ড, এক এক স্থানে এক একটি বীরপুরুষের প্রতিমূর্তি!  
গৃহ মধ্যস্থ একটি প্রসস্ত কুটীরের পর আর একটি কুটীর,

সে কুটীরটি নানা সজ্জায় সুসজ্জিত, তন্মধ্যে একখানি রৌপ্যময় সুচারু কারু কার্য খচিত বিচিত্র শয্যা-ব্যাণ্ড পর্য্যঙ্কে শৈলেশ্বর শয়ন করিয়া রহিয়াছেন--শয়নই বা কেমন করিয়া বলি ?--অর্দ্ধেক শয়ন, অর্দ্ধেক উপবেশন। সম্মুখে একখানি সুবর্ণ বিনির্মিত সুদৃশ্য পাত্রে তাংমূল রহিয়াছে। শৈলেশ্বরের মূর্তি অতি প্রশান্ত, গম্ভীর অথচ বীরত্ব-নাগরক : বর্ণ ক্রম বলিলেও বলা যায়, কিন্তু আবলুঘ ক্রম নয়--সচরাচর বাতাকে শ্যামবর্ণ বলে এ সেই বর্ণ : কপাল উজ্জল ও প্রশস্ত, তাহাতে বিভূতি ত্রিপুরা, নপো চন্দন টিপ ; নয়ন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বটে, কিন্তু সুদীর্ঘ নয়, আকর্ণ হইলে আরো চারি আঙ্গুল দীর্ঘ হইত ; নাসিকা সম্পূর্ণ টিকিল নয়, কিন্তু মুখের মানান মঠ ; শ্রবণ ও গুল্ফ উভয়ই সুদৃশ্য ; কণ নিরন্তর বীরবালা-ভরে ঝিৎৎ নাগিত। মলদেশ ব্রহ্মাক মালায় অতি সুন্দর দৃশ্য, তাহার নিম্নদেশে পলমতি কল্যা ; গঠন দোহারা, বিস্তৃত বীরপুরুষোচিত স্বর্ষ্য দেখিলে বোধ হয় অতি কোমল, বাস্তবিক স্থানে স্থানে প্রান্তর-বৎ কর্ণিন ; উদর বড় নয় ; বক্ষস্থল প্রশস্ত, কোম মহাকবি আপনার গ্রন্থের নায়ককে যে 'কপাট বক্ষ' বলিয়াছেন, সে শব্দ এখানেও সঙ্গত, বক্ষস্থলে অঙ্গ লোম ; বাহুপদ প্রভৃতি দৃষ্টে বোধ হয়, তিনি এক জন প্রসিদ্ধ বীর। শয্যা পার্শ্বে সুদীর্ঘ রত্নখচিত কোষাচ্ছাদিত অসি। তিনি তাংমূল চর্কন করিতে-ছিলেন, আর অন্যমনস্ক হইয়া নপো মধো কি ভাবিতেছিলেন, সেই সময়ে এক জন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, "দ্বারে চপলা ঠাকুরাণী দাঁড়াইয়া।" শৈলেশ্বর বলিলেন, "দ্বারায় লইয়া আইস।" তৎক্ষণাৎ দাসী প্রস্থান করিল। শৈলেশ্বরের মুখে পূর্বে যে চিন্তার চিহ্ন ছিল এক্ষণে আর এক ভাব--হর্ষ, সন্দেহ-বিমিশ্রিত অন্তত তাক্য কি ভাব; তাহা এক্ষণে জানিবার

আবশ্যক নাই, অনুমানে যা হয়। ক্ষমবিলম্বে দানী সঙ্গে চপলা প্রবেশ করিলে শৈলেশ্বর উঠিয়া বসিলেন, এবং সাহসান্বে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “চপলে! অসময়ে যে?” চপলা একটু মুখ মুক্কে হেঁসে বলিলেন, “ভাল আস্থান শিখেছেন, একটা মানুষ এলে বসতেও বলতে হয়।” শৈলেশ্বরও একটু হেঁসে বলিলেন, “রূপসী, ঐ আসন খানি দেও।” “আর আপনার লৌকিকতায় কাজ নাই, যথেষ্ট হয়েছে, পরমাপ্যায়ীত হলান,”—বলিয়া চপলা খট্টার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শৈলেশ্বর, “তবে চপলে এখন কেন?” চপলা, “কেন,—আসতে নাই?” শৈলেশ্বর, “তুমি আসবেনা তো আসবে কে? তবে চপলে বলি আহ কেমন? এখন তোমার সাক্ষাৎ দুর্লভ!” চপলা, “মন্দ থাকবে কেন, কি হয়েছে? সুখ ছুঃখ আপনার হস্তায়ত্ত্ব!” শৈলেশ্বর বলিলেন, “কে বলে চপলে সুখ ছুঃখ হস্তায়ত্ত্ব? তাহলে আমার মন সুস্থ নয় কেন?” চপলা, “তুমি নিরীকোষ” বলিয়া নিকটতঃ রূপসীর দিকে চাহিলেন। দুই বার রূপসীর নাম হইল, পাঠক মহাশয়, বোধ হয় বুঝিয়া থাকিবেন দানীর নাম রূপসী; রূপসীর চেহারা খানি কি দেখিবেন? রূপসীর নাম বিরাজিনী, কিন্তু তাহাকে যে ভাবেই হউক সকলে রূপসী বলিয়া ডাকে। এই বার আমাদের অন্তর কাঁপিতেছে, যাহার নাম রূপসী তাহার রূপ বর্ণন সহজ ব্যাপার নয়; কিন্তু পাঠক মনোরঞ্জন করিতে আমাদের সাধ্য মত চেষ্টা, সুতরাং চেষ্টা করিয়া দেখি দেখি রূপ খানি আপনাদিগের নয়ন-দর্পণে প্রতিবিম্বিত করিতে পারি কিনা।

শূর্য্য-কবিদিগের প্রদর্শিত পথই আমাদের অবলম্বনীয়, তাঁহাদের উপমাৱ ত্রবাই আমাদের উপমা!—এ বলিয়া

নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না, কতক কতক স্পর্শ করিতে চেষ্টা করি । রূপসীর মুখ খানি পদ্মের স্নায়, অঙ্গ কবিরাজ যেমন একদেশ গ্রহণ করেন আমাদেরও সেই এক দেশ,—পদ্মের বীজকোষ আমাদের একদেশ, বালিকা কালে রূপসীর মুখ মা শীতলার রূপায় ঠিক পদ্ম বীজকোষের অনুকরণ হইয়াছে, বোধ হয়, তাহাতেই শৈলেশ্বর মধ্যো মধ্যো অববিন্দনিতাননা বলেন । চন্দ্রের সহিত একদেশেও তো রমণীর মুখের সহিত উপমা হইয়া থাকে, আমাদের কি সে উপমা হবে না ? কেন, চন্দ্রে যেমন কলঙ্ক আমাদের রূপসীর মুখে তেমনি মেছেতা ! নাকটি বাঁশীর মত, কিন্তু সামান্য বাঁশী নয়, বাঁশের যে এক রকম মুখে বাজাবার বাঁশি আছে, ঠিক তাহার মুখের মত ! তাতেও আবার কারিকুরি,—মা শীতলার রূপা ! চক্ষু দুটি আকর্ষণে । অনেক কবিই বলেছেন, রূপসীর চক্ষু দুটি আনাক, এটি নুতন, সব পুরাতনও ভাল নয়, নারীর গভীরতা এটি খানেই রক্ষা হইবে ; কর্ণ—গৃধিনীগঞ্জিত, তাহার কর্ণের মত না হউক, তাহার ডানার মত, এও একদেশ,—তত বড় না হক, তাহার প্রতিরূপ ; ঠোঁট দুগানি তেলাকুচার ন্যায়, কিন্তু কাঁচা তেলাকুচা, বরং তদপেক্ষা মীলবর্ণ, তেমনি আয়তন ; দাঁতগুলি মুক্তার মত, কিন্তু সামান্য মুক্তা নয়, বিধাতা আপনার গলার জন্য এক ভরির উপর এক একটি মুক্তা গঠেছিলেন, শেষে ছিন্ন কর্ণার সময় ভেঙে যাওয়ায় রূপসীর বদনে রতনের কার্য্য করেছেন : কেমন বসাবার তারিপ, কোনটি সম্মুখ কোলান, কোনটি হেলান, আহামরি তারই বাকি শোভা, “খোলার ভিতরে যেন ঠেংয়ের আকার !” বিলক্ষণ ক্ষীণাক্ষী, সকল অস্থিই দেখা যায় ; হস্ত পদ লতার ন্যায়,—তা আর বলিতে হবে কেন, যে ক্ষীণাক্ষী ; স্রীলোকের নিতম্ব বড়

হইলেই সুন্দরী হয়, কিন্তু রূপসীর সেইটি হয়নি, বোধ হয়, বিধাতা রূপসীকে গঠিবার জন্য যে মৃত্তিকা করিয়াছিলেন, তার মধ্যে নিতম্বের মৃত্তিকা গুলি উদ্বার রাখা হইয়াছিল, শেষে জমাট বেঁধে যাওয়ার, নতম্বের মাটি উদরেই রয়েছে ; বর্ণ স্বর্ণের ন্যায়, কিন্তু বিধাতার কারু কার্য্য করিতে হইবে, খাটি সোণার তো ভাল হয় না, তাই খাদি সোণা দিয়াছিলেন, শেষে অগ্নি সম্ভাপে যে রূপ হইল, আবার রসান করিলে যদি মোহিত হন, তাই আর রসান করা হয়নি । কেমন পাঠক, রূপসীর মোহিনীছবি আপনার মন হরণ করিতে পেরেছে ? তবু আপনি রূপসীর প্রকৃত ছবি দেখিতে পেলেন না, আপনার রূপাল !

শৈলেশ্বর রূপসীকে সম্বোধন করে বলিলেন, “রূপসী, চপলা এলেন বসিতে বসিলেন।” রূপসী, “উহাদেরই ঘরকন্যা, ঠাকুরণ, আসনখানা দেক?” চপলা বলিলেন, “না রূপসী, তোমার আর যত্ন কর্তে হবে না, তোমার কর্তার কথাতেই যথেষ্ট হয়েছে।” শৈলেশ্বর এই কথায় একটু হাঁসিয়া চপলার মুখে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া সম্মেহ ও সান্নিধ্য স্বরে বলিলেন, “তোমার আস্থান কি চপলে ? তুমি কি আমার অন্তর হতে অন্য স্থানে আছ ? আমার হৃদয়পটে তোমার মোহিনী ছবি কি অঙ্কিত নয় ?” চপলা এ কথার কোন উত্তর না করিয়া একটু হাঁসিয়া শৈলেশ্বরের মুখে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ পূর্বক রূপসীর দিকে কটাক্ষ করিলেন ; এ কটাক্ষের ভাব কি ? যিনি বসিক, তিনিই বুঝিয়াছেন । এই ভাব, রূপসী যে এখানে ! চতুর শৈলেশ্বর চপলার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া রূপসীকে কহিলেন, “রূপসী, গোটা কতক পান মেজে আন দেখি।” “হাই” বলিয়া রূপসী চলে গেল । চপলা মনে করিলেন “পান তো যথেষ্ট রয়েছে, আমি একাকিনী পুরুষ সম্মিথানে, আর আমার থাকা

অনুচিত ।” শৈলেশ্বর সচকিতে বলিলেন, “তোমার মনের ভাব আমি এত দিনে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, বাহা হউক চপলে অসময়ে যে?” চপলা তত্বতরে কহিলেন, “আমাদের অধীশ্বর ভাল লোকের হাতে সকল ভার অর্পণ করে গিয়াছেন, তাঁহার সহধর্মিণী দিবা রাত্রি রোদন করিতেছেন, আহা! নিদ্রা ত্যাগ, আপনি আমোদে মত্ত?” “কেন তিনি কি এখনও আহা! করেন নি! চপলে!—এরই নাম প্রণয়!” বলিয়া শৈলেশ্বর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পুনরায় বলিলেন, “তাকে বলগে আমাদের মহারাজ কুলগৌরব আগামী কলাই আসিবেন, তিনি যেন বৃথা চিন্তা না করেন।” চপলা বলিলেন, “তবে আসি!” “কেন?—এখনি যাবে কেন?” শৈলেশ্বর এই কথা সচকিতে বলিয়া চপলার মুখে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলেন। “কেন?—এই যে আপনি বলিলেন,—তাকে বলগে! বিশেষ প্রভুর সহধর্মিণী উপোষিতা, আমার এখানে থাকা ভাল হয় না।” “চপলে, বলিতে কি, তোমার অভিশ্রম আমার পক্ষে যত দূর কষ্টকর তেনন ইহজগতে আর কিছুই নয়। শৈলেশ্বরের এই কয়েকটি কথা শুনে চপলার মুখে আনন্দ চিহ্ন প্রকাশ হইল। তিনি সেই আনন্দ স্বরে “তবে কি আমায় ভালবাস?” এই প্রশ্নটি করিয়া শৈলেশ্বরের মুখে সত্য দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলেন। শৈলেশ্বরের মুখেও অতুল আনন্দ চিহ্ন প্রকাশ হইল; তিনি চপলার নিকট সরিয়া আসিয়া বলিলেন। “চপলে এত দিনে বুঝিলাম, বিধাতা আমার অনুকূল, আমি যদি ভালবাসি, তবে তুমি কি আমায় ভালবাস?” পাঠক মহাশয়! দেখুন, চপলার দিকে দৃষ্টিপাত করুন, শৈলেশ্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, উভয়ের নয়ন উভয়ের মুখোপরি সংস্থাপিত, উভয়ের চক্ষু

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

আহারোন্মোগ—আমি কি আমার ?

‘বিললাপ স বাস্পগদগদঃ সহজামপাহায় ধীরতাং ।

অতিতপ্তময়োঃপি মাদব-ভজতে কৈব কথা শরীরিণাং ॥’

চপলা শৈলেশ্বরের নিকট হইতে কুসুমিকার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখেন কুসুমিকার বামকরে গণ্ড সংস্থাপিত, নয়ন অশ্রুজলে প্লাবিত ও বিস্ফারিত, মন যেন ধ্যানধারণা করিয়া রহিয়াছে। কোন কবি বলিয়াছেন,—“বিরোগিনীর লক্ষণ যোগিনীর মত,” কিন্তু আনাদিগের কুসুমিকার সে সকল থাকিতে ও নয়ন নাসিকোপরি সংস্থাপিত নয়; ঐ দেখুন দৃষ্টি উন্নত দিকে! চপলা কুসুমিকার নিকট গেলেন, কিন্তু কুসুমিকা তাহা জানিতে পারিলেন না! এ আশ্চর্য্য ভাব! চক্ষু মুদ্রিত নয় অথচ দৃষ্টি হীন! চপলা বলিলেন,—“দিদি শৈলেশ্বর”—চপলার রগনা আজ শৈলেশ্বরের নাম করিতে কিছু কুণ্ঠিত হইল।—“শৈলেশ্বর বলিলেন—আগামী কলাই আসিবেন, আপনি অত ভাবিতেছেন কেন? আপনি আহার করেননি শুনে তিনি আমাকে কত বল্লেন!” কুসুমিকা চপলার সকল কথা শুনিতে পাইলেন না, সদীঘ নিঃশ্বাসে বলিলেন,—“চপলে, কি বলিতেছ?” চপলা—“আপনি এখনও পূর্বের স্থায় রহিয়াছেন? শৈলেশ্বর বলিলেন তিনি আগামী কলাই আসিবেন!” কুসুমিকা—“কে আসিবেন চপলে? চপলা—“আমাদের রাজপুত্র কুল গৌরব, এই ছোপের বা পৃথিবীর অধীশ্বর, যিনি আপনার এই দশা করিবার কর্তা!” কুসুমিকা চপলার মুখে সম্ভ্রম দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিলেন, কোন কথা বলিলেন না! চপলা পুনরায় বলিলেন,—“তবে এখন উঠুন।”

এখনও তো মুখে জল দেন নাই, এই খানেই কি আহার কর্কেন ?" কুসুমিকা বলিলেন,—“এখনও বিলম্ব আছে, আচ্ছা শৈলেশ্বর কি বলিলেন, তিনি আগামী কলাই আসিবেন !” “হ্যাঁ, তিনি বলিলেন । আর আপনি এখনও আহার করেন নি শুনে আমাকে কত অনুরোধ করলেন !” চপলার এই কথা শুনিয়া কুসুমিকা বলিলেন,—“তবে বুঝি আমি আহার করিনি শুনেই একথা বলে থাকবেন ?” চপলা বলিলেন না, তিনি নিশ্চয় বল্লেন, আগামী কলাই আসিবেন, এখন আহার করুন !” কুসুমিকা বলিলেন,—“তবে কলাই আহার করিব !” “এও কি কথা ? না খেয়ে শরীরটা নষ্ট করিবেন কেন ? এরকম শুনিলে লোকের কি মনে করিব ! কিম্বি বা আমাদের আসিয়া কি বলবেন ?” “তবে আন”—কুসুমিকার এই কথা শুনিয়া চপলা চলিয়া গেলেন । কুসুমিকা পুনরায় নামকরে গণ্ড সন্তোষপন করিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে পুনরায় জলধারা পতিত হইতে লাগিল, কপোতবাচি জলধারা উরস কুচতম্ব নিভৃত করিয়া ক্রমশঃ আসন স্পর্শ করিল, হৃদয় বাপিভেৎ লাগিল ! নিশ্বাসরুদ্ধ ক্ষণ বিলম্বে দীর্ঘ শ্বাস । “কাল কি আসিবেন ? এবেই বা কি হবে ! তিনিতো এই সে দিন এবে- ছিলেন ; আবার কোথায় যাবেন ! না, আমি এবার যাইতে দিব না, তা কোন বারেই বা যাইতে বলে থাকি ? না, এবারেতো বলেছেন আর এখন কোন খানে যাইবেন না, অনেকবারইতো শুকথা বলিয়া থাকেন ! প্রণয়িনীৰ অনুরোধ-দাসীর অনুরোধ রাখিবেন না ? মহারাষ্ট্রীয়দের নিকট যুদ্ধের অনুরোধ সর্বাপেক্ষা প্রধান ; যাহা হউক এবার তিনি আসিয়া যদি কোন স্থানে যাইতে চাহেন, তবে আমি তাঁহার সম্মুখেই এই চিরদক্ক জীবন বিসর্জ্ঞন দিব ! তিনি কি কাল আসিবেন ?



হৃদয়, একথা তোমার একবারও বিখ্যাস হইতেছে না ! কুমুমিকা সবিলে দে অক্ষুটষরে সদীঘ'-নিম্বাসে এই কয়েকটি কথা উচ্চারণ করিলেন । চপলা খাত্তব্রবা হস্তে তিন জন রমণী সহ পুনরায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—“তোমরা রাখিয়া যাও !” ভাঙ্গার গৃহের একপাশে খাত্তপূর্ণ পাত্রগুলি রাখিয়া চলিয়া গেল । চপলা কুমুমিকাকে বলিলেন,—“দিদি, মুখে অল দিন !” কুমুমিকার তখন হৃদয় অস্থির, তিনি বিস্ফারিত নয়নে চপলার মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—“কি বলিতেছ ?” “আপনি অতো অধৈর্য্য হইলেন কেন ?” “আপনার কি সকলই পরি-বর্তন হইয়াছে ? আপনি যে আমার যথেষ্ট স্নেহ করেন, আপনি বৈ আমার আর কে আছে ? আপনি যদি নিরন্তর এই ভাবে থাকেন, তবে আর আমার জীবনে সুখ কি ? আমার অত্যন্ত দুর্ভাগ্য !” চপলার এই কয়েকটি কথা বলিতে বলিতে চক্ষুতে অশ্রুচিহ্ন প্রকাশ হইল । কুমুমিকা চপলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—“চপলে আমি কি আমার !”

---

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

যাত্রা—শিব-শম্ভু ।

“শস্ত্রো মহেশ করুণাময় শূল-পাণে,

গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশ-নাশিন্,

কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেকঃ,

ত্বং হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোহসি !”

চপলা যখন আছেন কুমুমিকার আহার করিতেই হইবে : এখন আর এখানে থাকা উচিত নয়, একবার রণজয়ের সুদূর তরী দেখিয়া আসা যাক, লেখকের লেখনী চঞ্চলা—যতাবতই

চঞ্চলা—এক স্থানে স্থির থাকিতে চাহে না; এখন একেবারে  
রণজয়ের নিকটযাইতে সমুদ্রত, কিন্তু বোধ হয় অনেকেরই মন  
চপলার অভিনয় স্থান হইতে বাইতে অনিচ্ছুক। রমণীর  
অভিনয় স্থান হইতে কোন ব্যক্তি বীর-পুরুষের ভয়ানক অভিনয়  
দেখিতে বাঞ্ছা করে? বিশেষতঃ আমরা তো বঙ্গবাসী! এই  
তো সেই সমুদ্র তরী! এই তো সমরসিংহ নক্সভাবে দাঁড়াইয়া  
রহিয়াছেন!—এ কে? রণজয়. এ বেশ কেন? মহম্মদী বর্ষা  
গৃহিতের আয়, আশ্রয় ও গুলাকে বন্দনমণ্ডল আচ্ছাদিত! এই কি  
সমর বেশ? হইবে—দৈনিক গুরুবোহা চলনা বোঝা অতি কঠিন।  
এখন প্রদোষ! সূর্য্যদেব সমস্ত দিন প্রভুর আঁজা প্রতিপালন  
করিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। নৃপ আরাধক! দুষ্টি তাঁর;  
শীঘ্র এখানে বিদ্রোহ স্থানান্তরিত হইতে চলিলেন! পক্ষীগণ সূর্য্য-  
দেবকে বিদায় লইতে দেখিয়া তাঁহার কার্য্যায়মানের অতি-  
নন্দন স্বরূপ উচ্চৈশ্বরে সাধুবাদ আরম্ভ করিল। চতুর্দিকের  
কুসুম হইতে পুষ্পগন্ধ হরণ করিয়া বায়ুদের সেই স্থান আচ্ছা-  
দিত করিয়া তুলিলেন। সকলের অবস্থা সমান হয় না। কবচ-  
মাণি সমুদ্র সূর্য্য করে তপ্ত হইয়া বাহিরে কষ্ট ভোগ করিতে  
হিলেন, এক্ষণে লোহিত কটাক্ষে সূর্য্যদেবকে তিরস্কার করি-  
তেছেন! সেই সময়ে কাল সুলভ গগনমণ্ডল ঘন ঘটার আচ্ছন্ন  
হইল! বিদ্রোহপাত, বায়ু সঞ্চালন বদ্ধ হইল! রণজয়ের  
আদেশে সমুদ্র স্রোতের চতুর্দিকে নক্ষর হার দৃঢ়বদ্ধ হইতে  
লাগিল! বায়ুর প্রবলতা! মেঘের গজ্জন! ঘন ঘন বিদ্রোহ-  
পাতঃ—ক্রমশঃ বড় উঠিল। সমুদ্র তরঙ্গ বৃদ্ধি! বৃষ্টি!—পোত  
খানি হেলিতে ছুলিতে ও সমস্ত গুণকর্ত্ত কল্পিত হইতে  
লাগিল; সকলে ব্যস্ততা পূর্ব্বক পোতের রক্ষা কার্য্যে মিশ্রিত  
হইলেন। মেচনী বস্তু দ্বাৰা জল সেচন হইতে লাগিল! অগ্নে

স্ফাকৃত বায়ুর বেগশক্তি, বৃষ্টি-বৃদ্ধি হইল! সমরসিংহ বলিলেন,—“আর ভয় নাই! হুয়ায় এ উপভবের শাস্তি হইবে!” ক্রমশঃ গগনমণ্ডল পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিল!—ঝড় ও বৃষ্টির শাস্তি!

কৃত্রিম বেশ বিভূষিত রণজয় যুদ্ধ বেশ বিভূষিত সমস্ত সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“আজ তোমাদের গুণ গৌরব বৃদ্ধি হইবে!—তোমরা সকলে বীরবর! সমরসিংহের আদেশ মত কার্য্য করিবে! দেখ, যেন তাহার অন্যথা হয় না! সকল সেনাপতিরা মস্তকাবনত করিয়া সাহসাদে,—“যথা অনুমতি”—বাক্য উচ্চারণ করিলেন। রণজয় ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিলেন।—এখনো কি তাঁর মূর্তিপথে কঠিন হৃদয়ে প্রনয়িণীর মোহিনী ছবি অঙ্কিত আছে? না, তিনি যে কুসুমমালা বিসর্জ্ঞন দিয়াছেন! তবে রণজয়ের মুখ ওরূপ কেন? ইষ্ট দেবতা স্মরণে কি নয়ন সজল হইয়া উঠিল? না, প্রস্তুত যখন যা অঙ্কিত হয়, তাহা বহু যত্নেও যায় না! রণজয়ের হৃদয় প্রস্তুত যাহা খোদিত, তাহা হঠাৎ যাইবার নহে। রণজয় অঙ্গ হারিলেন, এ হারির অর্থ কি? “মন, এখনো ভুলিতে পার নাই?” পুনরায় ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিলেন, পারিষদবর্গ অমূল্য শব্দে জয়োচ্চারণ করিল! সন্মুখস্থ পুরোহিত নির্মালা প্রদান করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। রণজয়,—“পশুপতি,” মহারাষ্ট্রীয় কুলের গৌরব বৃদ্ধি করুন ও তোমার সেবকেরা নিঃকটক হউক”—বলিয়া সকলের মুখেরদিকে চাহিলেন! দেখিলেন, সকলের মুখেই সাহসের সাহসের চিহ্ন বর্তমান! তাহার সাহসের দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল! জাবিলেন আশা-লতা অঙ্কুরিতা। পার্শ্বদেশেই সমরসিংহ উপস্থিত! তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় কহিলেন,—“সমর, মতর্ক থাকিও!” সমরসিংহ

মস্তকাবনত করিলেন । আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তখনও চন্দ্রমাকুসুমিনীকে প্রস্ফুটিত করিতে পারেন নাই এবং তখনও তাঁহার ছবি পশ্চিমাংশে অধিক হেলে নাই ! এই সময় একগানি ক্ষুদ্রতরী রণজয়ের অর্ণবযানের নিকটস্থ হইতে লাগিল । রণজয় সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, মহম্মদীয় পরিচ্ছদাবৃত এক জন আসিতেছে । সেটি যে তাঁহাদিগের গৃঢ় চর তাহা রণজয়ের সেই দৃষ্টিতেই প্রকাশ পাইল !

তরী খানি রণজয়ের পোতের নিকটস্থ হইল । উপর হইতে বজ্র নিষ্ক্ষেপিত ও উভয় তরী একত্রে বন্ধ হইল । আগন্তুক রণজয়ের মুখের দিকে তাঁহার অনুমতির আশায় নম্র-মস্তকে চাহিয়া রহিলেন । রণজয় বলিলেন, “অজয় কি দেখিলে ?” আগন্তুক উত্তর করিল, —“আজ্ঞা সবলেই আজ শাহ্লাদে মত, কনকন নগর নান। বজ্রায় বিভূষিত ! সব-লেই সহস্র চিত্রে আগামী কল্য যুদ্ধের জয় হইবে ভাবিয়া তাহার নিশ্চয়ত্বচক নানা গল্প করিতেছে ! রণতরী সমুদ্র রক্ষকশূন্য বলিলেও হয় ! কোন সৈনিকই বিশেষ মতকর্মনহে ! আমেন অদ্য প্রমত্ত প্রায় ! সুরাপান, নষ্টকী নৃত্য প্রভৃতিতে সময়ক্ষেপণ করিতেছে ! আমি এত ভ্রমণ করিলাম, কেহই কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না ! মহারাজ, বলিতে কি ইহা-দের মত অসাবধানী সৈনিক পুরুষ আমি কখন দেখি নাই ! রণজয় বলিলেন, “তবে আর বিলম্ব করা উচিত নয় !” “ভব-গতি মঞ্চল করুন” বলিয়া ক্ষুদ্রতরী আরোহণ করিলেন ! একলে অনুচ্চশব্দে “বোম-শিব” শব্দ উচ্চারণ করিল, পুরো-হিত স্থতিবাচন পাঠ করিলেন ।” রণজয় “শিব শব্দ !” বলিয়া প্রস্থান করিলেন ।

প্রণয়ে কি না হয় ?

অগ্নিকাণ্ড—ইহারা কি দম্ভা ?

“তন্নাপবজ্জিতৈস্তুষাং শিরোভিঃ স্মৃজ্যমৈর্মহীম্।

তস্তার সবঘাব্যটৈশ্চৈঃ সক্ষোদ্রপটলৈরিব।”

পাঠক মহাশয়, চলুন একবার কনকন নগরটি দেখিয়া আসি। আমাদের নারক রণজয় যখন অর্ণবপোত হইতে চলিলেন, তখন আর এখানে থাকিয়া কি করিব! আর যখন সমুদ্রযাত্রী করিয়াছেন, যখন বীরপুরুষের অভিনয় দেখিতে এত দূর অগ্রসর হইয়াছেন, তখন শেষ দেখা চাই! একটু নাহয় তো ভাল! চিরকালই তো জীপুলের নারায় বন্ধ থাকিলেন!

কনকন নগর আজ সুসজ্জিত! এতো শ্রী কেল? ঐ বে সমুদ্র-তটে রক্তবর্ণ পতাকা-সুশোভিত সমুদ্র যান সকল রহিয়াছে, ও গুলি কি বাণিজ্য পোত? তাহা হইলে চতুর্দিকে আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত কেন?—না, আমেদনাতা সমুদ্র যাত্রা করিবেন তাহা-রই সজ্জা! ঐ গুলি দেখিয়াই রণজয় বিপক্ষ সৈন্য সংখ্যা করিয়াছিলেন! যুদ্ধ সজ্জা!—সৈন্যগণ কোথায়? দেখুন স্থানে স্থানে অবশ্যই আছে! আমেদ স্বর্গশাস্ত্র কোরাণের বাক্যে আপনাদিগের জয় নিশ্চয় করিয়াই অদ্য সৈন্যাদিগকে উৎসাহ প্রদানার্থ আমোদ করিতেছিলেন! ঐ দেখুন, প্রশস্ত শিবির! বহুসংখ্যক সৈন্য আমোদে মত্ত, এক জনও প্রহরীর কার্যে নিযুক্ত নাই! সকলে বাঙ্গালীকি রামায়ণের কাগনেমীর ন্যায় লক্ষা ভাগ করিতেছে! কেহ সুন্দরী রমণী লাভ, কেহ অসংখ্য ধন লাভ, কেহ বশিষ্ঠাদিগের প্রতি নির্ভরতা করিবার কল্পনা করিতেছে! কোন কোন উদ্ধত সৈনিক অহ

স্মারসূচক শব্দে—“অনেক দিন মর শোণিতভাবে তরবারি  
অপরিষ্কৃত রহিয়াছে, এই এক পরিষ্কৃত করিবার উপায়!”  
—বলিয়া স্বীয় বীরত্বের উপমাঙ্গ করিতেছে। যে সময়ের  
ঘটনা, পূর্বেই বলা হইয়াছে;—সে সময়ে কনকন দিল্লীশ্বরের  
অধিকার ভুক্ত, আমেদসাহ নামে এক ব্যক্তি রাজপ্রতিনিধি  
কনকনে থাকিত, সেই সময়ে রণজয়ের সৈন্যেরা প্রায়ই  
কনকন লুট করিত, আমেদসাহ চতুর, তাহার যে সৈন্য ছিল  
তাঁহাদিগের দ্বারা রণজয়ের অধিকৃত সুবর্ণ ভূগ আক্রমণ করা  
কোন মতেই সম্ভব নহে, যেহেতু তিনি বিলক্ষণ জানিতেন,—  
সুবর্ণ ভূগ সুরক্ষণে রক্ষিত,—ভূগস্থ ভূগ যেতি। সুতরাং  
তিনি কৌশল করিয়া দিল্লীরবাদশাহকে লিখিয়া পাঠাইলেন—  
কনকন এক একার সুবর্ণ ভূগের দখলদিগেরই অধিকৃত  
হইয়া উঠিল, তাঁহাদিগকে শাসন না করিলে কনকন রক্ষা  
কর না, বাদশাহ অধীনে সৈন্য সংখ্যা অল্প, সুতরাং রাজধানীর  
সৈন্য—সাহায্য প্রার্থনা, এখানকার সৈন্যসহ আমি প্রস্তুত  
রহিলাম তথাকার সৈন্য পোছিলেই রণ সুবর্ণ ভূগ  
আক্রমণ করিব। দ্বিতীয় আলমগির তখন নাম মাত্র সম্রাট,  
দাজিউদ্দীনই কহে, তিনি আমেদের পত্র পাঠে ভাবিলেন,—  
রাজ্যের যে অবস্থা এসময় আর সৈন্য পাঠান কর্তব্য নহে,  
আমেদসাহের প্রতি তাঁহার বিশ্বাসও ছিল না। সুতরাং  
তদুত্তরে লিখিলেন—“এ সময় এখান হইতে সৈন্য পাঠান  
সম্ভবেনা, তথায় যে সৈন্য আছে তদ্বারা সুবর্ণ ভূগ আক্রমণ  
না করিয়া কনকন রক্ষা করিতে যত্নবান থাক,—এখানকার  
সমরানল কিছু নির্বাণিত হইলেই সৈন্য পাঠান হইবে।—”  
সেই পত্র যে দূত লইয়া আইসে, রণজয়ের দূতেরা তাঁহা  
কাড়িয়া নয়, এবং রণজয়কে দেয়;—আমেদ সাহা পরোক্ষ

পাইতে বিলম্ব দেখিয়া ভাবিলেন, সৈন্য পাঠানই নবাবের মত হইয়াছে,—ছুরাকাজ্ঞা আমেদের মনে ছিল, সৈন্য আসি লেই সুবর্ণ দুর্গ আক্রমণ করিবেন, এবং সেই উৎসাহ বর্জন জন্যই আজ সৈন্যদিগকে আমোদ করিতে অনুমতি দিয়াছেন ।

আমেদ কোথায়? ঐ তো একটি সুদৃশ্যহর্ম্য! চলুন দেখি,— এই যে কয়েক জন রক্ষক স্বকার্য্য নির্বাহ করিতেছে! এই স্থানেই বোধ হয় আমেদ আছেন! এই বাটীটি নানা আলোকে সুসজ্জিত, প্রথম কক্ষেই এক খালি বহুশিল্প-পরিচয়প্রদায়ক অমূল্য রত্নরাজি-খচিত সুদৃশ্য সিংহাসনে বহুমূল্য পরিচ্ছদাবৃত এক জন উপবেশন করিয়া আছেন! এনিই কি আমেদ?—হবে! পার্শ্ব দেশে তদপেক্ষাকৃত কিঞ্চিন্নূন পরিচ্ছদ বিভূষিত চারিজন উপবিষ্ট! অতি নিকটে একখানি সুবর্ণপ্রথিত প্রস্তরাসনে সুরার ন্যায় কি রহিয়াছে! আমেদ যে মুসলমান,—একি?—সুরা—না সরবৎ! সুরাই বটে, ঐ যে একটি সুন্দরী ষোড়শী মধ্যে মধ্যে প্রদান করিতেছে! সুরেশ্বরী না হইলে এতো মান কার? ইনিতো মুসলমান, যে হিন্দুজাতির সুরাপানে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, তাহারাই বড় ছাড়ে! সুরে,—তোমার মহিমা কার সাধ্য বুকে তুমি নর্দমা শয্যাকারিণী, তুমি রাজপুরুষ হৃদয়চারিণী, তুমি নব্য-সভ্যতা-ভাণদায়িনী, তুমি ব্যভিচারদোষ-জননী, তুমি অচেতন-সহচারিণী, তুমি অবজ্ঞাব্যাণীপ্রসবিণী, তুমি অশেষ রোগকুল সৃষ্টিকারিণী, তথাপি সভ্যজনহৃদয়চারিণী !!

আমেদ সাহের বয়স যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছে বটে কিন্তু মনে যৌবন রসতরঙ্গ নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছে! প্রাচীন কবির যৌবনেই রসের প্রবলতা বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা কি তাহা অস্বীকার করিব? কখনই নয়। তবে আমাদের

মতে যৌবনে তরল রস,—দেখিতে অনেক,—সার কম : কিন্তু  
বয়সে পরিপাক!—যেটুকু থাকে ঘন,—সার!—সাহার গলে,—  
তাহার পক্ষে যৌবন কোথায়? আমাদের পাঠক মহাশয়-  
গণের মধ্যে যিনি যৌবনসীমা অতিক্রম করিয়াছেন তিনিই  
জানেন, একথা কতদূর সঙ্গত! সাহার আবার তাহার উপর  
যুবতী ভাষণ,—তিনিতো সেই রসেই হাবুডুবু!—মহাকবি  
চুড়ামণি জয়দেবের—“দেহিপদপল্লবমুদারং”—তাহার মুখস্থ!  
রসিকের চিরকালই বসন্ত। আমেদ আমাদের কতক অংশে  
সেই দলের লোক, কিন্তু অভিমানী, অথচ এক এক সময় গম্ভীর।  
বর্ণ গোলাপ পুষ্পের সদৃশ, কিন্তু পর্যায়িত গোলাপ যেমত  
সঙ্কুচিত ও ঈষৎ মলিন ইহারও সেই রূপ! ঐ দেখুন, বদন-  
মণ্ডলের ত্বক ঈষৎ কুঞ্চিত! গুচ্ছ ও অক্ষর সমাবিন্যস্ত, বোধ  
হয় কৃষ্ণতা পরিহার করিয়াছে, কিন্তু নিরন্তর রঞ্জিত হেতু  
অবোধগম্য! চক্ষুঃ আকর্ষণও নয়, ক্ষুদ্রও নয়। শিরা সমুদ্র  
আরক্ত দৃষ্টি অহংকারবাজক! নাসিকা সুদৃশ্য, কিন্তু টিকন  
নয়! কপোল মাতিশয় রক্তবর্ণ, বোধ হয়, রাগরঞ্জিত! গঠন  
কিছু দীর্ঘ, কিন্তু স্থূল থাকায় তাহা ইয়াৎ বোধ হয় না!  
অন্যান্য অবয়ব পরিচ্ছদাবৃত, অস্তুতি সুগঠিত। হস্তের প্রায়  
সকল অঙ্গুলিতেই বহুমূল্য রত্ন গ্রথিত অঙ্গুরীয়, পার্শ্বে  
এক খানি বর্ত্তবিধ রত্নাচ্ছাদিত কোমলক অনি। সমুদ্রে দুইটি  
সুন্দরী রমণী কোকিলকণ্ঠে সঙ্গীত করিতেছে। আমেদ মনো  
মধ্যে মস্তক সঞ্চালন করিয়া তাহাদিগকে চরিতার্থ করি-  
তেছেন! এমত সময়ে একজন দূর হইতে রীতিমত রাজভক্তি  
দেখাইতে দেখাইতে পার্শ্বদেশে করণাটে দণ্ডায়মান হইল।  
আমেদ পার্শ্বস্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মাত্র তিনি কহিলেন,—  
“সংবাদ?” আগন্তুক “জনাব,—সুবর্ণ ভূগের দস্তাদিগের



নিকট হইতে একজন বন্দী সন্ন্যাসী আদিয়াছে, অনুমতি  
হইলে রাজদর্শন করে।" বলিবামাত্র আমেদ পার্শ্বস্থের  
প্রতি কটাক্ষ করিলেন। পার্শ্বস্থ সঙ্কেতমাত্র—“দুরায় লইয়া  
আইস”—বলিলে আগন্তুক প্রস্থান করিল। পার্শ্বস্থ চারি-  
জন রাজসভাসদ, কিন্তু নিকটস্থ বাহার প্রতি আমেদ দুই-  
বার লক্ষ্য করিলেন, তিনি যে প্রধান পদাভিষিক্ত মন্ত্রী  
তাহা বলাই বাহুল্য! তাঁহাদের এই কথোপকথনের সময়ই  
রাজসঙ্কেতে গীত বন্ধ হইল। আমেদ কহিলেন,—“মামুদ,  
বোধ হয় ইহার দ্বারা দস্যুদিগের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানা  
যাইবে।” পাঠক মগাশয়, স্মরণ রাখিবেন, পার্শ্বস্থ মন্ত্রী  
নাম মামুদ। মামুদ বিনয়াবনত মস্তকে নম্রতরে বলিলেন,—  
“মহারাজ, বাহ্য বিবেচনা করিয়াছেন, যথার্থ বটে, কিন্তু  
এই সন্ন্যাসী যদি প্রকৃত বন্দী হয় তবেই জানা সম্ভব। শুনি-  
য়াছি, দস্যুরা সাতিশয় চতুর, সতত গৃঢ়চর দ্বারা সন্ধান লয়।

এই সময় সন্ন্যাসী ও পূর্ব আগন্তুক সম্মুখে উপস্থিত।  
সন্ন্যাসী প্রথমতঃ রীত্যানুসারে অভিবাদন করিল। তাহার  
আকার মলিন, কিন্তু দেখিলেই বোধ হয়, উহা জগতে তাহার  
সম্মুখে ভয়েয় বস্তু কিছুই নাই! উপবাস ও ঈশ্বরোপসনার  
মলিন। মায়েদ বলিলেন,—“আপনিই কি সুবর্ণ ভূর্গের  
দস্যুগণের বন্দী?” “মহারাজ, এই হতভাগাই দস্যুদিগের  
বন্দী।” সন্ন্যাসীর এই কথায় আমেদ বলিলেন,—“দেখি-  
তোঁ, আপনি সন্ন্যাসধর্ম্মাক্রান্ত, আপনি কি জন্য বন্দী হই-  
লেন?” “মহারাজ, দস্যুদিগের নিকট সন্ন্যাসী কে? আমি  
সনাতন মহম্মদ-ধর্ম্মাক্রান্ত কতিপয় বণিকের সহিত শান্তি  
ভূর্গে যাইতেছিলাম, দস্যুরা বাণিজ্য পোত লুণ্ঠন ও বণিক-  
দিগের সহিত আমাকে বন্ধন করে। আমি মৃত্যুর জন্য ভীত

হই নাই, কিন্তু চিরকালের নিমিত্ত যে স্বাধীনতারত্ন অপহৃত ও বিধর্মিগণের সহবাসী হইতে হইয়াছিল এই আমার দুঃখ ! মহারাজ, তজ্জনাই আমি নিরন্তর পলাইবার চেষ্টা করিতাম । অবশেষে মঙ্গলদেবের কুপায় এক রাত্রে এক খানি মৎস্যজীবী নৌকা দস্যুদিগের পোতের নিকটস্থ দেখিয়া লক্ষদ্বার, তাহা-  
দিগের আশ্রয় গ্রহণ করি, অধুনা মহারাজের আশ্রয়ে নিভীত হইয়াছি ।” সম্রাটের এই কথার শেষে আমেদ বলিলেন,—  
“আপনি কি বলিতে পারেন দস্যুরা কি কপে স্বীয় অনায়াসে পাতবিত্ত ও আবাস রক্ষার জন্য মুক্ত সজ্জা করিতেছে ? আমা-  
দিগের যুদ্ধোচ্চোগ তাহারা জানিতে পারিয়াছে, কি না ?”  
সম্রাট কহিলেন,—“মহারাজ, আমি এক জন সামান্য বাদী, মাত্র ছিলাম, নিরন্তর স্বাধীনতার জন্যই ব্যগ্র থাকিতাম, আমার দ্বারা এক জন গুপ্তচরের কার্য হওয়া অসম্ভব, কিন্তু  
এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে দস্যুরা বাস্তব বিপদ তাচ্ছিল্য জ্ঞান করিয়া আছে, তাহা আমার পলায়নেই অনুভূত হই-  
তেছে । যদি রক্ষকেরা সতর্কের সহিত স্বকার্য্য সাধন করিত, তবে কি আপনার আশ্রয় লওয়া ঘটিত ? আমার পলায়নেও তাহারা যেকূপ আলস্য কবিয়াছে, আপনার গমনেও তদন্ত-  
কূপ করিবে ! মহারাজ, আমার শরীর নানাকর্মে অবশ, এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, অনুমতি করুন, অল্প দান দিন, অধীন এক্ষণে বিদায় গ্রহণ করুক ! জগদীশ্বর আপনাদিগের মঙ্গল করুন ।” আমেদ কহিলেন,—“বাণিক, অতো অধৈর্য্য হইও না ! আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি এখানে উপবেশন কর, তোমাকে আরো আমার জিজ্ঞাস্য আছে, তাহার প্রকৃত উত্তর দেও, যদি অত্যন্ত ক্ষুবর্ত্ত হইয়া থাক,—এখনি তোমার জন্য আহারীয় সামগ্রী আমার অনুচরেরা আনিয়া দিতেছে-

যখন এত লোকের আহার হইতেছে, তখন কখনই তোমার আহারের জন্য কষ্ট পাইতে হইবে না! আমি গোলযোগ ভালবাসি না। সকল সুস্পষ্ট বল!” এই সময় সন্ন্যাসীর মুখে কাম্পনিক ভয়ের উদয় হইল, বাস্তবিক তিনি আমেদের সভাকে অত্যন্ত তাচ্ছীল্য করিতেছিলেন। “মহারাজ,—এসকল খাদ্য আমার নয়!” সন্ন্যাসীর কৃত্রিম ভয়বিকৃতস্বরের এই কয়েকটি কথা শুনিয়াই আমেদ কহিলেন,—“ কেন,—তুমি কি বিবেচনা করিয়াছ এসকল বিধর্মীদ্বারা পোষিত?” “না—মহারাজ, কিন্তু ফলমূলই আমাদেরিগের খাদ্য, সুরস সমূহসেবনে বিষয় বাসনার বৃদ্ধি হয়!” সন্ন্যাসীর এই উত্তর শুনিয়া আমেদ বলিলেন,—“আজ্ঞা তোমার ইচ্ছা না হয় আহার করিবার প্রয়োজন নাই—এক্ষণে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়া নির্ভয়ে যাত্রা কর। দস্যুরা কর খানি যুদ্ধতরী সুসজ্জিত করিয়াছে!”—

আমেদ রাজের বাক্যের অসমাপ্তিতেই চতুর্দিকে তাহার ধ্বনি উপিত হইল। সমুদ্রতীর আলোকময়! তথাৎ একজন দূত দ্রুতপদে রাজসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার অস্পষ্ট ভয়বিকৃতস্বরে আমেদ শুনিলেন,—“দস্যুরা সমস্ত যুদ্ধপোতে অগ্নি দিয়াছে এবং অসংখ্য সৈন্য অকস্মাৎ চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করিয়াছে!” এই সময় আমেদ ও তৎপারিষদেরা দূতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া স্তম্ভিত ভাব অবলম্বন করিলেন। আমেদ ক্ষণকাল মধ্যেই দেখেন সন্ন্যাসী তথার নাই। তাহার ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল ও সুগভীর শব্দে “সন্ন্যাসী কোথায়? সন্ন্যাসী কোথায়?—তাহাকে বন্ধন কর, সেই সকলের মূল”—বলিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

আর অপেক্ষা করিলেন না, স্বীয় তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া উঠিলেন। পার্শ্বদ্বারা বংশীধ্বনিদ্বারা সৈন্যগণকে যুদ্ধ করিতে সঙ্কেত করিল, দ্বারদেশে হইতে দেখেন আর সে সন্ন্যাসী নাই, এক জন প্রবল বীর, যুদ্ধ-সজ্জায় আবরিত, অগ্নি নিষ্কোষিত, অশ্বোপরি সংস্থিত! কতকগুলি সৈন্য লইয়া যনস্বরূপ ভয়ব্যস্ত সৈন্য সংহার করিতেছে! তিনি এক জন সৈনিকের একটি অশ্বে আরোহণ করিয়া নিকটস্থ সকলকেই যুদ্ধের আজ্ঞা দিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই তাহার কথা শুনিল না, সকলেই ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। চতুর্দিকে ভয়ানক রবে—“শিব শস্যু” শব্দ প্রতিধ্বনিত হইয়া নগর যেন কম্পিত হইতে লাগিল। আমেদ আগন্তুক অশ্বারোহী বৃদ্ধ সহিত যুদ্ধার্থ স্বয়ং অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন আর আমেদের সৈন্যমাত্র নাই, সকলেই ভয়ে পলায়মান! যে দুই এক জন অসমসাহসী সামান্য পদাতিক তাঁহার অগ্রসর হইয়াছিল, সকলেই অচিরে আগন্তুকের ভয়ানক যুদ্ধে নিহত হইল। নগরটি স্বপক্ষশোণিতসিক্ত! চতুর্দিকে হত্যাকার ধ্বনি ও আগ্নেয়াস্ত্রের এবং অগ্নি নিক্ষেপণের শব্দ। আর ভাল দেখা যায় না! মামুদ বলিলেন,—“আমি অগ্রসর হওয়া কর্তব্য নয়, আমেদ সূতরাংই সাহসকে বিসর্জন দিয়া পলায়ন করিলেন।” আগন্তুক তাহা লক্ষ্য করিতে না পারিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া সম্মুখস্থ বিপক্ষ পাক্ষীয়দিগকে নষ্ট করিয়া পূর্ব সভায় উপস্থিত হইলেন।

আগন্তুক কে?—সন্ন্যাসীবেশ, রণজয়?—তা আর বলিতে হইবে কেন? চতুর পাঠক মহাশয়েরা বোধ হয় পূর্বেই বুঝিয়াছেন; কিন্তু এখন সন্ন্যাসীর মূর্তিও নাই, পূর্বের মূর্তিও নাই মুখাকৃতি কাস্তি শূন্য! রণজয় একটি বংশীধ্বনি করিয়া সঙ্কেতে

জানাইলেন,—“তোমরা সাহস সহকারে যুদ্ধ করিতেছ, কর !”  
 তিনি ক্রমশঃ অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন,  
 হঠাৎ সেই সময় সমরসিংহ কতিপয় যোদ্ধাসহ উপস্থিত  
 হইয়া নতশিরে রণজয়ের নিকটস্থ হইলেন। যুদ্ধকালে কি  
 সকলের আকৃতিই বিভিন্ন হয়? সমরসিংহের মুখও ভয়ানক।  
 অধুনা আমাদের দেশের লোক হইলে একরূপ মূর্ত্তি দেখিলেই  
 মুচ্ছাপন্ন হয়! রণজয় সমরকে বলিলেন, “সমর,—যথেষ্ট  
 করিয়াছ, কিন্তু এখনও যথেষ্ট বাকি আছে! আমেদ বদ্ধ  
 না হইলে সকলই বুথা! আচ্ছা, তরীতে অগ্নি প্রদান করিলে  
 নগরে এখনো কেন অগ্নি না দেও, আর বিলম্ব কেন? কনকন  
 ভস্ম করাইত ভাল!”—বলিবা মাত্রই রাজপুত্র সৈন্যচর কন-  
 কনস্থ যাবতীয় গৃহে অগ্নি প্রদান করিতে সমুদ্যত হইলেন।  
 রাজ প্রাসাদে আগ্নেয় দ্রব্য দ্বারা অগ্নি প্রদত্ত হইল, এবং  
 মুহূর্মুহু ভয়ানক আগ্নেয়াজ্ঞে ভগ্ন হইতে লাগিল। প্রাসাদটি  
 কম্পিত ও অগ্নিব্যাপ্ত!—এই সময় বাটীর অভ্যন্তর হইতে বামা-  
 দলের করুণস্বর উদ্ভূত হইল। সেই স্বর রণজয়ের হৃদয়ে  
 দয়ার সঞ্চার করিয়া দিল, রণজয় অস্থির হইলেন। তিনি  
 বারংবার সৈন্যগণকে চিৎকার শব্দে বলিতে লাগিলেন,—  
 “বোধ হয়, এতো দিনে মহারাক্ষি বংশে কলঙ্ক রোপণ হইল!  
 যদি আনাদের এই ব্যাপারে একটিও ভীকৃৎস্রভাবা অবলার  
 মৃত্যু হয়, তবে আর পাপের ইয়ত্তা থাকিবে না!”—বলিবা-  
 মাত্রই সকলে রমণীকুলের উদ্ধারের নিমিত্ত যত্নবান হইতে  
 লাগিল। রণজয় অপেক্ষা করিলেন না! অগ্নির ভয়ানক  
 উত্তাপ লক্ষ্য না করিয়া দাহ্যমান পথদ্বারা অন্তঃপ্রকোষ্ঠে  
 প্রবেশ করিলেন। তৎসহ আরো কতিপয় বীর প্রবেশ  
 করিয়াছিলেন। রণজয় দেখেন, একটি দুসজ্জিত গৃহেচারি

জন অস্থির। রৌদ্রদ্যমান। আসন্নমৃত্যুনিশ্চয়া অবলা, তন্মধ্যে এক জন অপেক্ষাকৃত বহুমূল্য অলঙ্কার ও পরিচ্ছদে অলঙ্কৃত! রণজয় তাহাদিগকে সংক্ষেপে আশ্বাস বাক্যদ্বারা সামান্য-রূপে সান্ত্বনা করিলেন, এবং বলিলেন,—“ভয় নাই, মহা-রাষ্ট্রীয় দ্বারা অবলাদিগের কিছুমাত্র হানির সম্ভাবনা নাই! এখনো মহারাষ্ট্রীয়েরা মহম্মদীয়ের ন্যায় অধর্ম্মাচারী হয় নাই!” তাহাদিগকে ভয়বিম্বলা ও সঙ্কটচিত্তা দেখিয়া পুনরায়—“রক্ষার্থ স্ত্রীলোকের অঙ্গস্পর্শ পাপকর নয়।”—বলিয়াই দ্রুতপদে উদ্ধারের জন্য দুই জনকে লইয়া আদিত্য লাগিলেন, এবং সমরসিংহ আর দুই জনকে লইয়া অগ্নিমধ্য হইতে নিরাপদে বাহিরে পৌঁছিলে, রণজয় সাদরে বলিলেন,—“তোমাদের কোন বিশ্রামের নিকটস্থ গৃহ আছে? এ লঙ্কার সময় নয়, শাস্ত্র বল, তথায় রাখিয়া আসা হইবে!” এক জন মধ্যবয়স্ক নরদ্বয়ে বলিলেন,—“অতি নিকটেই আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়ি, যদি তাহারা অগ্নিদগ্ধ না হইয়া থাকেন, তবে তথায় আশ্রয় লাভ করিতে পারিবা।” বলিয়া মাত্রই রণজয় সমরসিংহকে আদেশ করিলেন,—“নতর্কে দ্বারায় ইহা-দিগকে নির্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া আইস,—দেখ যেন সনাতন ধর্মে কলঙ্ক স্পর্শ না হয়?” যাঁইবার সময় সর্বাপেক্ষা বহুমূল্য ভূষণভূষিতা রতনগীটি তিন চারি বার রণজয়ের মুখে দৃষ্টিপাত করিয়াছিল। সে দৃষ্টিপাতের অর্থ কি?—যিনি কখন সে ভাবে পতিত হইয়াছেন, তিনিই জানেন! সে দৃষ্টি সরলভাগ্য, তথাচ এক এক জনের হৃদয়ে ভয়ানক কুটিলতার কার্য্য করে! তাহাদিগের অন্তর সরল, তাহারা সে ভাব দেখিয়া কি স্থির থাকিতে পারেন! কিন্তু আমাদের কঠিন হৃদয় রণজয়ের পক্ষে কি হয়, তাহা বলা যায় না! যুদ্ধক্ষেত্রে বীরপুরুষের

কখন কি সে ভাব ঘটিয়া থাকে? কি জানি, কিন্তু ভাগ্যক্রমে রণজয় তাহা লক্ষ্য করেন নাই। যখন আর রণজয়কে দেখা যায় না, তখন সেই কামিনী মধ্যমবয়স্কার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল “রোমন্থা, ইহারা কি মন্থা?”

নবম পরিচ্ছেদ ।

আক্রমণ। ————— মহম্মদের জয় !

“যদি সমরমপাশ নাস্তি মৃত্যোভয়মিতি যুক্তমিতো  
চন্যতঃ প্রয়োক্তম্। অথ মরণমবশ্যমেব জন্তোঃ  
কিমিতি সূণ্য মালিনং যশঃ কুরুধ্বং।”

কনকনের প্রসাদ সমূহ অগ্নিদক, সুবর্ণ-দীপ্তিমান, অনন্তপুরে অবসাগণের করুণাময় শব্দে মহারাক্ষীদিগের হৃদয় আকুলিত, সকলেই অন্তঃকরণে সনাতন ধর্মের ভয়ে শত্রুসমীপের রক্ষা কার্যে ব্যস্ত, সেই সময়ে আমেদসাহ গুনরায় বহুসৈন্য সহ আক্রমণ করিলেন। আমেদ বারম্বার গম্ভীর উত্তোজিত স্বরে বলিতে লাগিলেন,—“কি মুসলমানদিগের মধ্যে কি কেহ বীর নাই,-কতিপয় মানান্য মন্থা দ্বারা মুসলমানেরা পরাজিত হইল! আজ কনকন যদি ভুগর্ভে নিহিত হইত, তবে এতো দুঃখ হইত না।”—সৈন্যগণ উৎসাহদ্রুতমিশ্রিত গম্ভীর শব্দে বলিয়া উঠিল,—“মহারাজ,—হঠাৎ আক্রমণে সকলে বিহ্বল হইয়াছিল, নিশ্চয় জানিবেন,—দস্যুর রক্তে “কনকন সিক্ত না হইলে কেহই মুখ দেখাইবে না,” ক্রমশঃ রাজ-প্রাসাদের নিকটস্থ মহারাক্ষীদিগকে আবর্তন করিয়া মুসলমানেরা যুদ্ধ আরম্ভ করিল, যাহারা পূর্বে ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, যাহারা মহারাক্ষীদিগের নিকট জীবন ভিক্ষা চাহিয়াছিল, যাহারা

মহারাক্ষীর শরণাপন্ন হইয়াছিল,—তাহারা সকলেই এক্ষণে  
 দ্বিগুণতর সাহসে যুদ্ধ আরম্ভ করিল! তখন মহারাক্ষীরেরা  
 প্রান্তঃ—বিশৃঙ্খলা প্রাপ্ত—বুদ্ধবৈশ-পরিত্যক্ত! এবং ভীক  
 রমণীগণের রক্ষার্থ ব্যগ্র! তাহারা হঠাৎ আক্রমণে অভুল  
 সাহসকে বিসর্জন দিয়া পলায়নে তৎপর হইল; কেহই যুদ্ধে  
 অগ্রসর নহে, রণজয় সকলকে সাহস প্রদান করিতে লাগি-  
 লেন। এবং ভীষণ দস্তে কতিপয় সৈন্যসহ যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর  
 হইলেন! দেখেন, তাহার প্রধান প্রধান সোদ্ধূরগে কেহই  
 নিকটে নাই, সৈন্যগণও পলায়নে তৎপর! যুদ্ধে জীবন  
 রক্ষার উপায় অত্যাশ!—সুতরাং প্রথমতঃ শত্রুসৈন্য বৃহৎ  
 ভঙ্গ করিয়া পলায়নের চেষ্টা আরম্ভ করিলেন,—সে চেষ্টা  
 ব্যথা হইল! শত্রুসৈন্য বৃহৎ এমতই দৃঢ়বদ্ধ যে কিছুতেই রণ-  
 জয় সফলমনোরথ হইতে পারিলেন না, তাহার পারিশ্রম্য  
 অচিরেই বিপক্ষ হস্তে নিবন প্রাপ্ত হইল, তখন তিনি অন-  
 ন্যোপায়, একাকী! ভীষণ মৃত্তি! পরিশেষে যুদ্ধে মৃত্যুই ঘির  
 করিয়া প্রবলবেগে বিপক্ষ সৈন্য সাহস করিতে লাগিলেন!  
 সেই সময়ে তাহার হস্তে অসি প্রত্যেক নিম্নে বিপক্ষ  
 শোণিতনিষ্ঠ হইতে ছিল! আমেদ বলিলেন,—“নরাদমকে  
 প্রাণে মারিও না, তুরায় বন্ধন কর, যুদ্ধে মৃত্যু রাজদ্রোহীর  
 উপযুক্ত শাস্তি নহে!”—কিন্তু কেহই তাহার সম্মুখীন হইতে  
 পারিতেছে না! রণজয় সগজীর বীরত্ব সূচক শব্দে বলিলেন,  
 “প্রাণে না মারিলে তোদের নিস্তার নাই!” সেই শব্দ বিপক্ষ  
 সৈন্যও প্রতিধ্বনিত হইল! সে সময়ে সে তাহার অগ্রসর,  
 সেই ধরাধারী! এই সময়ে মায়ুদ সদন্তে বলিলেন,—“কাকের,  
 যদি প্রাণে ভয় থাকে তুরায় অস্ত্র ত্যাগ কর!”—“মহারাক্ষীরের  
 সমরে প্রাণের ভয়,”—বলিয়াই রণজয় মায়ুদকে লক্ষ্য করি-



বাটীতে আছেন—মামুদের এই উত্তরে আমেদ অশ্রু চালাইলেন, সৈন্যগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল,—“মহম্মদের জয় ! মহম্মদের জয় !”

দশম পরিচ্ছেদ ।

এলাহিজান,—দস্যু-দলপতি বন্দী !!

“যথা দোষঃ বিভাজ্যঃ জনশ্চ ন তথা গুণঃ,—

প্রায়ঃ কলঙ্ক এবোদ্ভোঃ প্রক্ষুটো ন প্রসন্নতা ।”

রাজ্য যে কয়েকটি রমণীকে অগ্নিকুণ্ড হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, বেগম এলাহিজান যে তাহার মধোর একটি তাহা আর বলিতে হইবে কেন? আমেদ যাহার অনুসন্ধান লইলেন, রাজপ্রাসাদে সখীবৈষ্ণিতা তিনি বাতীত আর কে? প্রিয়-পাঠক,—চলুন, একবার তাঁহাকে দেখিয়া আসি। সুন্দরী যুবতী! নবাবের বেগম! তাঁহাকে দেখিতে কি আপনার অভিরাচ হয় না? “না” বলিলে আমি শুনিয়া, আখ্যায়িকা বা নাটক পাঠ করিতে যাহার রুচি, তাহার দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রাবল্যতা নাই, কে এ কথা বিশ্বাস করিবে?

এলাহিজান কোথায়? পূর্বেই মামুদের মুখে শুনা গিয়াছে, ওমরা আব্দুলের বাটীতে! আব্দুলের বাটীটি মন্দ নহে, কনকনের রাজপ্রাসাদ ও তাহার বাটীর স্ত্রী হরণ করিতে পারে নাই! মর্ম্মর প্রস্তরপ্রথিত, চতুঃপ্রকোষ্ঠে বিভক্ত! তৃতীয় প্রকোষ্ঠের একটি সুসজ্জিতগৃহে এক খানি পালঙ্কোপরি এলাহিজান বসিয়া আছেন, এলাহিজান নবাবের বিবাহিতা স্ত্রী নয়, পূর্বে এক জন সামান্য পরিচারিকা ছিলেন, এক্ষণে আমেদের মনোহরণ করায় তাঁহার বেগম শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন,

যে বাটীতে এলাহিজান অধিদক্ষ হইতে ছিলেন, সে বাটীও প্রকৃত নবাবের অন্তঃপুর নয়, তাঁহার অন্তঃপুর ভিন্ন স্থানে, আজ আমেদ যুদ্ধযাত্রা করিয়া সাগরতটস্থ আরামগৃহে ছিলেন, তাঁহার আবাসগৃহ তথা হইতে এক ক্রোশ দূরে, মধ্যে মধ্যে আমেদ এলাহিজানকে লইয়া এবাটীতে বাস করিতেন, আজও বনমপ্রবৃত্তি নিবৃত্তি করিবার আশয়ে এলাহিজানকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন, আমেদের মনোহরণ করিবার এলাহিজানের সম্পত্তি কি ? সৌন্দর্য্যতা ? আমেদের অন্তঃপুরে কি তাঁহার ন্যায় সুন্দরী নাই ? কে দেখিয়াছে, নবাবের অন্তঃপুর পরিদর্শন করে কাহার ক্ষমতা ? কিন্তু তাহা থাকিলেও “যাহ যাতে পড়ে মন !” আর একটি উপকরণ আছে, চঞ্চলতার কামাসক্তদিগের মনোহরণ করিবার এই একটি প্রধান উপকরণ। এলাহিজানের রূপটি এই স্থলে চিত্রিত করা উচিত, কিন্তু আমাদের লেখনীর তাদৃশী শক্তি নাই, সে রূপ যে প্রকৃত চিত্রিত হইবে এ আশা নাই, তথাপি কর্তব্য কার্য্য, স্মরণ্য বস্তুর হয়।

এলাহিজানের বর্ণ প্রস্ফুটিত গোলাপবিনিম্বিত, মোমের মুখটি কিছু গোল, কপোল ক্ষীততাই তাহার কারণ। কপোল দুইটি আর কিঞ্চিৎ নিম্ন হইলে আরো সৌন্দর্য্যতা হইত। কিন্তু বিধাতার সৃষ্টি, কে অন্যথা করিবে ? কপোল যতাবতই লোহিত, তাহাতে নিরন্তর রাগরাগিত হওয়ার অপেক্ষার বক্তব্য হইয়াছে। চক্ষু প্রায় আকর্ণ, কর্ণ স্পর্শ করে নাই বটে, কিন্তু যে রূপ দীর্ঘায়ত, বোধ হয় এই রূপ লক্ষ্য করিয়াই করিয়া আকর্ণ বলিয়া থাকেন, চক্ষুমধ্যস্থ শিরা সমূহ আরক্ত ! অভ্যন্তরস্থ গোলকটি, বিলক্ষণ কৃষ্ণবর্ণ ও চটুল। পল্লব দুখানি খণ্ড কৃষ্ণপক্ষ্মরাজীতে সম বিন্যস্ত ; অস্থির ! আদর টানা, যেন চিত্রিত, কথা কহিবার সময় ঈষৎ সঞ্চালিত হয়। দৃষ্টি কুণ্ঠিত,

কামরম-উত্তেজক, তাকাইলে বোধ হয়,—কটাক্ষ করিতেছেন। সে দৃষ্টিতে কার মনোহরণ না হয়? আমেদ কি সাধে প্রণয়িনী করিয়াছেন? যে দৃষ্টি!! নাসিকা টিকল, বোধ হয়,—আর এক সূতা পাতলা হইলে ভাল হইত, কিন্তু মুখের মানন নই! অধরৌষ্ঠ পাতলা,—বিলক্ষণ রক্তবর্ণ, তাহা রঞ্জিত নয় বটে, কিন্তু নিরন্তর তাবুল তক্ষণে অতো লোহিত! কর্ণ ক্ষুদ্র, গৃধিনীর কর্ণের শোভা বিশেষ করিয়া কখন দেখি নাই, সুতরাং বলিতে পারি না,—গৃধিনী গঞ্জিত কিনা! নানাবিধ কর্ণভরণে ঈষৎ নমিত, একটি হীরক “চুল” ছলিতেছে, সেটি শ্বেত বটে, কিন্তু কপোলের ছায়ায় লোহিতাভা প্রকাশ পাইতেছে! ললাট ক্ষুদ্র! কপোলে বিলক্ষণ রক্তবর্ণ কুন্তল গুচ্ছ! কবরী বন্ধনে সুবর্ণ বিনির্মিত হীরকমণ্ডিত কুল! সম্মুখে একখানি অনূচ্চ মুকুট, মধ্যদেশে একটি উজ্জ্বলনীলমণি, চতুর্পার্শ্বে বহুবিধ বহু মূল্য ভাস্বর প্রস্তর! উপরে মুক্তাশ্রেণী, সে অলঙ্কারটি মুখের শোভা দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত করিতেছে! গলদেশ বর্তুলাকার, ক্রমোন্নত তিনটি রেখা বিরাজিত! তাহাতে গজমতি কণ্ঠী! মধ্যদেশে একখানি দীপ্তিময় হীরক, তাহার চতুর্পার্শ্বে রক্তবর্ণ প্রস্তর! গঠন ক্ষীণাক্ষীর ন্যায় নয়, একহারার অপেক্ষাও স্থূল; সুকোমল! একপ গঠনে কি রূপ হস্ত পদ হয় সহজেই অনুমিত হইবে। কোন কবির “রামরস্তা জিনি উরু, কদলিকান্তের গুরু” ইত্যাদি বর্ণন এ নায়িকার সম্পূর্ণ সঙ্গত! স্তন দুইটি প্রায় আট অঙ্গুলি পরিমিত উচ্চ, কঠিন! উদর স্থূল নয়, কিন্তু ত্রিবলি আছে! মধ্যদেশটি বিলক্ষণ ক্ষীণ, সে স্থানটি লক্ষ্য করিলে ক্ষীণাক্ষিনী বলা যাইতে পারে, নিতম্ব স্থূল, যুবক-কুল মনোহর! হস্ত পদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, লোহিতাভ শ্বেতনখর সুশোভিত সুচারু অঙ্গুরি গ্রথিত, রাগ-রঞ্জিত, নানা বহুমূল্য

মৌন্দর্য্যময় ভূষায় বিভূষিত ! সর্ব্বাঙ্গই প্রায় একটি নীলবর্ণ পরিচ্ছদাবৃত, উপরে একখানি মুক্কু সুকারককার্য্য পরিচায়ক সুবর্ণ ফুলময় উত্তরীয় বা ওড়না ! ক্ষীণাজিণী নয়, আমাদের দেশের সুন্দরী না হইতে পারে, কিন্তু পাঠক,--একবার যদি আপনি সেই সদৃশ্যিত স্মিতমুখের কথা শুনাউতে পারিতাম, তবে বুঝিতাম,--আপনারা তাহাকে সুন্দরী বলেন কি না ? এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকেন কি না ?

এলাহিজানসন্দিগ্ধচিত্তা চিন্তাকুলা ও অন্যমনস্ক হইয়া একবার উঠিলেন, গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলেন, দ্বারে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া কি ভাবিলেন, আবার পালঙ্কে আসিয়া উপবেশন করিলেন, এই সময়ে আমেদসাহ মসৈন্যে রণজয়কে বেষ্ঠন করিয়াছেন, এলাহিজান, নবাবের বেগম একাকিনী কেন ? তাহার প্রকৃত উত্তরের অধুনা অপ্রয়োজন ! সময় ! কোমলা এলাহিজানের হৃদয় তো প্রস্তুতময় ? নচেৎ, যে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছে, তাহার প্রাণ রক্ষার কি চেষ্টা করিলেন ? তাঁহার জন্যই তো রণজয় প্রবল শত্রু মধ্যে অসহায় ! তাঁহার হৃদয় কি রূপ কে জানে ? সময় আসুক, মন হঠাৎ জানা যায় না সময়ে কার্য্যে প্রকাশ পায়--সময়ে জানা বাউরে ।

একটি রমণী আসিয়া প্রবেশ করিল, এলাহিজান বাস্তব স্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,--“রোসনজা--কি দেখিয়া আসিলে ?” রোসনজাহা আনন্দ প্রকাশক স্বরে উত্তর করিল,--“আর ভয় নাই, আমাদের দৈন্য, দস্তাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে, অন্য কি,--নবাব সাহেব স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন, দস্তারা সকলেই ভগ্নোৎসাহ হইয়া পলায়ন করিতেছে, যে দস্তা আমাদের প্রথমে উদ্ধার করিয়াছিল, তাহার কি দুঃসাহস, একাকী এখনো ভয়ানক সংগ্রাম করি-

তেছে। শুনিলাম, তিনিই নাকি দস্যুদলের অধিপতি ! ”—এলাহিজান কেবল সবিস্ময় ভয়ে বারংবার—“য়্যা—য়্যা”—করিলেন ! তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, মুখ মলিন হইয়া গেল, রোসনজাহার বাক্যের সমাপ্তিতে বারংবার বলিলেন,—দস্যু দে?—কারা দস্যু ? ” রোসনজাহা সেই ভাব দেখিয়া আশ্চর্যান্বিতা হইলেন, তিনি এলাহিজানকে সন্মোদন করিয়া বলিলেন,—“বেগম,—একি ভাব ? এ সংবাদে হর্ষ হওয়া দূরে থাকুক, দেখিতেছি,—আপনার মুখ মলিন হইল ! আপনি কি নবাবের অনিচ্ছাশঙ্কা করিতেছেন ? সে ভয় নাই,—যদিচ প্রথমতঃ আমাদিগের সৈন্যেরা নিতান্ত ভীকর ন্যায় কার্য করিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে আর সে রূপ নাই, আমি যেমত যুদ্ধের ভাব দেখিয়া আসিলাম,—তাঁহাতে অচিরে আমাদের জয় হইবে ! ”—এই সময়ে রণজয় বন্দী হইলেন, সৈন্যগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, সেই জয়ধ্বনি এলাহিজানের হৃদয়ে আঘাতিত হইল, তিনি কাঁপিতে লাগিলেন ! এলাহিজান পুনরায় আগ্রহ-প্রকাশক স্বরে বলিলেন,—“তবে কি সকলেই বন্দী হইয়াছে ! ” “আমি দেখিয়া আসি নাই, কিন্তু যে দস্যু অসমসাহসে আমাদিগকে সেই অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ধার করিয়াছিল, সে যে অচিরে বন্দী হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, যদিচ তাহার সাহস যুদ্ধকৌশল প্রভৃতি অসাধারণ, কিন্তু তাহার সঙ্গিগণ কতক পলায়ন করিয়াছে, কতক নিহত হইয়াছে, একাকী সমরে কে অসংখ্য মৈন্য জয় করিতে পারে ? বেগম,—সেই দলপতি,—সুতরাং তাহার বন্দীতেই সকল দস্যু বশীভূত হইবে ! এবং কনকনে শান্তিসংস্থাপন হইবে। ”—রোসনজাহার এই কথার অনবসানেই এলাহিজান তৎক্ষণে হুঃখ-প্রকাশক স্বরে বলিলেন “তাঁহাকে বন্দী করিবে

কি প্রাণে মারিবে, কেমন করিয়া জানিলে ?” “তাহার স্থিরতা নাই বটে, কিন্তু সেই দলপতি, সকলেরই আজকার এই দুর্ঘটনায় ভয়ানক রাগ হইরাছে, সুতরাং তাহাকে সমরশায়ী করিবে বোধ হয় না, বিশেষতঃ সকলেই দস্যুদিগের আজকার এই অত্যাচারে সমূহ রাগত, যাহাই হউক, অন্য অবশ্যই মঙ্গল হইবে, মহম্মদ অবশ্যই রূপাদৃষ্টি করিবেন, যে প্রকারে হউক দস্যুদলপতির প্রাণ নাশ ও দস্যু দল বিচ্ছিন্ন অবশ্যই ঘটিয়াছে !”—রোসনজাহার এই কথায় এলাহিজান বলিলেন,— “দস্যু কে ?—ইহারা না তোমার নবাব ! যে ভীষণ শত্রুর মণীষ প্রাণ রক্ষার্থ আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে উদ্যত, যে একাকী সমুখ সংগ্রামে অসংখ্য শত্রুর অগ্রসর, সে ?—না,—বেঙ্গলসংখ্য সৈন্যে এক জনকে বধ করিতে ব্যগ্র, আপনার প্রাণ রক্ষার্থ অন্তঃপুর রক্ষা করিতে অক্ষম, সে দস্যু ?” রোসনজাহার এলাহিজানের কথায় অবাক, তাহার অন্তর ব্যাপিত। উঠিল, মুছ অথচ বিষম সূচক স্বরে বলিল,—“বেঙ্গল,—আজ এতকি ভাব, নবাবের মঙ্গল কি তোমার প্রার্থনীয় নয় ?”—এলাহিজান বলিলেন,—“রোসন,—আমি জানিতাম,—তুমি সরাসরি তোমার দয়ার শরীর, এই কি তোমার সরলতা ?—এই কি তোমার দয়া ?—যে প্রণয় লালসায়”—এই কথায় শেষ না হইতে গৃহের দ্বার মুক্ত হইল, একজন সমরবেশধারী সুন্দর যুবককে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া রোসনজাহার সচকিতে মুছস্বরে বলিলেন,—“ওমরা আসিতেছেন !”—আগন্তুক ওমরা আবুদুল,—তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—“রোসন,—আজ আমায় সোভাগ্যের সীমা নাই, অভাবনীয় অচিহ্নীয় অতিথি আমার গৃহে, অথচ আমি সন্নগসী, নবাবের বেগমের আতিথ্যের উপযুক্ত দ্রব্য আমার গৃহে থাকা অসম্ভাবনা, তবে

বেগমের আমার প্রতি দয়া আছে,—তজ্জনাই ভরসা ; যদিও  
 রাত্রি অনেক হইয়াছে, কিন্তু আমার প্রতি রূপা করিয়া অদ্য  
 অতিথি সংকার গ্রহণ না করিলে সাতিশয় দুঃখিত হইব।  
 আপনি দাসীদিগকে বলিয়া আমার অবস্থোপযোগী নবাবের  
 বেগমের অনুপায়ুক্ত যৎকিঞ্চিৎ আহারের উদ্যোগ করুন,—  
 দাস বেগমের নিকট নিতান্ত বাধ্য হইবে।”—রোসনজাহা  
 এলাহিজানের মুখে সম্মতি সূচক দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—  
 “দাসী আপনাই, আজ্ঞাবাহিকা!” এলাহিজান কোন  
 কথা কহিলেন না,—বরং সম্মতি সূচক দৃষ্টিপাত করিলেন,—  
 রোসনজাহা চলিয়া গেল। এলাহিজান আবতুলের প্রতি দৃষ্টি-  
 পাত করিয়া বলিলেন,—“কি—যুদ্ধে জয়ী নাকি?” “হাঁ  
 সকল স্থলেই কেবল এক জায়গার”—এলাহিজান আবতুলের  
 এই সহাস্য উত্তরে বাধা দিয়া বিরক্ত অথচ উত্তেজিত স্বরে  
 বলিলেন,—“বর্তমান যুদ্ধের সংবাদ?” আবতুল সচকিতে  
 এলাহিজানের মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া কথাকিঞ্চিৎ অপ্রতিভ ভাবে  
 বলিলেন,—“দস্যুদলপতি বদ্ধ হইয়াছে, অধিকাংশ দস্যুই  
 পলায়ন করিয়াছে, কতকগুলির শোণিতে কনকন মিশ্র হই-  
 য়াছে,”—এলাহিজান নিস্তব্ধ, ক্ষণ বিলম্বে ভগবৎ স্বরে বলি-  
 লেন,—“দস্যুদলপতি বন্দী?”

---

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

ইতিহাস!—আনি জানি না?

---

“নোদামং হসতি ক্ষণং কলয়তে হ্রীযন্ত্ৰণাং কামপি,  
 ক্ষিপ্রস্তাব গভীর বক্রিমলবস্পৃষ্টং মনোগ্ ভাষতে,  
 সজ্জতস্বমুদীক্ষতে—”

“আবদুল কে?” পাঠক মহাশয়েরা এ প্রশ্ন করিতে পারেন, কারণ আমাদের অন্তরও এই প্রশ্ন করিতেছে।— বিশেষতঃ এই আখ্যায়িকার বিষদতা সম্পাদনার্থ আবদুলের পরিচয় দেওয়া কর্তব্য, কেবল আবদুলের কেন, এক ইতিহাসে এলাহিজানেরও ইতিবৃত্ত বলা হইবে !

কনকন নগরই আবদুলের জন্মভূমি, আবদুল এক জন ধনীৰ সন্তান, এবং এলাহিজানের খুল্লতাজ্জ ভ্রাতা, মুসলমান-দিগের পিতৃব্য-কন্যা-বিবাহ প্রথা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, বাল্যকালে সেই প্রথানুসারে আবদুলের সহিত এলাহিজানের বিবাহ হইবার কথা হয়। কিছুদিন পরে জ্ঞাতি বিবাহে এলাহিজানের পিতার সহিত আবদুলের পিতার সনাত্তর সূত্রে যে সম্বন্ধ উচ্ছিন্ন হয়, অথচ বালাবধি এলাহিজানের সহিত আবদুলের একত্র সহবাসে উভয়ের অন্তরে প্রেমের অঙ্কুর স্থাপিত হইয়াছিল, ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধিসহকারে সেই অঙ্কুর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যখন এলাহিজানের পিতাব সহিত আবদুলের পিতার বিবাদ গাঢ় হইয়া উঠিল,—এমন কি মুখ দেখাদেখি পর্যান্ত থাকিল না, তখনও এলাহিজানের ও আবদুলের প্রণয়ের কিছু মাত্র ন্যূনতা হয় নাই এলাহিজানের পিতা ইহাতে আপনার অমঙ্গল আশঙ্কায় আবদুলকে তাঁহার বাটীতে আশ্রিতে নিবেদন করিলেন। আবদুল সে নিবেদন তিন দিন মাত্র মনে রাখিয়া ছিলেন, শেষে উভয়ের অদর্শনে উভয়েই অধৈর্য্য হইয়া পুনরায় পূৰ্ণতাব ধারণা করিলেন। সেই সংবাদে এলাহিজানের পিতা আরও কুপিত, ও সান্দ্র হইয়া আবদুলকে যথেষ্ট তিরস্কার করতঃ বাটী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। আবদুলের পিতাও এমংবাদে আবদুলের প্রতি যথেষ্ট তিরস্কার করেন,—আবদুলের মাতা বলিয়াছিলেন,—



“কেন,—আপনার মেয়ে সামলাতে পারেন না;”—আবদুলের পিতা বলিলেন,—“ও মর্কোখই বা যায় কেন? ও যদি পুনরায় যায়, তবে আমি উহার মুখ দেখিব না!”—আবদুল অভ্যস্ত তিরস্কৃত ও লজ্জিত হইয়া কয়েক দিন আর এলাহিজানের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, এলাহিজান এই কয়েক দিবস নিস্তান্ত চুঃখিত ছিলেন। যদিও এলাহিজান তাঁহার পিতা মাতার একমাত্র অপত্য, সুতরাং যৎপরোনাস্তি স্নেহভাগিনী; কিন্তু জাতি বিবাদ কি ভয়ানক, তিনি সেই কয়েক দিন সন্তানার পরিবর্তে কেবল তিরস্কার শুনিতেন! উভয়ের অন্তরে প্রণয়ের ছবি অঙ্কিত না হইলে প্রণয়ের গাঢ়তা হয় না। যদিও তখনও তাঁহারা কৈশোর বয়সে পদার্পণ করেন নাই, যদিও তখনও তাঁহারা স্নরের শরের শরবোর উপযুক্ত হন নাই, কিন্তু তথাপি পরস্পরের তদানীন্তন অবস্থা দেখিলে নানা সন্দেহ হইত! একপা বিচ্ছেদও অধিক কাল যটে নাই, পরস্পর অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন, শেষে এলাহিজান আবদুলকে এক পত্র লিখিলেন,—“প্রিয় ভ্রাতঃ,—তোমার পক্ষে আমার পিতার বা পিতৃব্য মহাশয়ের তিরস্কার অধিক কষ্টের কারণ, কি আমার সহিত অসাক্ষাৎ অধিক কষ্টের কারণ? যদি প্রথমটি অধিক কষ্টের কারণ হয়, তবে চির চুঃখিনী হতভাগিনী আশাকৃত স্নেহ ভাগিনী অধীনা ভগিনী শেষ বিদায় লইতেছে,—আমরা অপরাধ ভুলিয়া যাও, কখন না কখন স্নেহে হউক অস্নেহে (লিখিতে লেখনী চাহে না,—কি করি সুতরাং লিখিতেছি) হউক আমাকে স্মরণ করিও,—এলাহিজান নাম যেন জগতে কখন না কখন তোমার জিহ্বা হইতে ধ্বনিত হয়! আর ভাই,—দ্বিতীয়টি অধিক কষ্টজনক হইলে অন্য সাক্ষ্যের পর অন্তঃপুরের পশ্চাত্তের উদ্যানে আসিয়া

সাক্ষাৎ করিবে।”—এই পত্র আবছুল ছুই তিন বার অধিক ভাবে পাঠ করিলেন, তাঁহার মেধা পূর্ব্বের অপমান বিস্মৃত হইল। সেই দিনই এলাহিজানের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন,—উভয়ে প্রথম দর্শনে কেবল রোদন করিলেন। পুনরায় নিত্য উভয়ের দেখা হইতে লাগিল। ছুই চারি দিবস পরেই এলাহিজানের মাতা সমস্ত জানিতে পারিয়া স্বীয় স্বামীর নিকট বলিলেন। তিনি পুনরায় উভয়কেই যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রণয়ের কি অদ্ভূত গতি, কিছুতেই পরস্পর অবদর্শন নহা হইত না, শেষে এলাহিজানের পিতা অন্য উপায় না দেখিয়া তাঁহার একজন বন্ধুর অন্তঃপুরে তাঁহাকে রাখিয়া আইলেন, অতি অল্পদিন পরেই এলাহিজানের পিতা মাতার মৃত্যু হয়, সেই মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বই এলাহিজানের পিতা তাঁহার পিতৃ বন্ধুর সহিত পিতার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। এলাহিজানের পিতা এলাহিজানের হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহার বন্ধুর নিকট সমস্ত বিভবাদি রক্ষার ভার সহসমর্পণ করিলেন, বৃদ্ধ বারম্বার বলিলেন, কুমারী জুখিনী আমি চিরকাল কষ্ট দিয়াছি,—আজ চব্বিলাস, জন্মের মত চলিলাম, ইহার গুরুধারণীও মৃত্যু-শয্যায় শয়ানা,—বন্ধো,—ভুমিই এখন ইহার রক্ষক,—ইহার যাহাতে কোন কষ্ট না হয়, তাহা করিও।—আর বাক্যক্ষুণ্ণ হইল না, বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া অনবরত অশ্রু পতন হইতে লাগিল!—এলাহিজানের মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া চিরজীবনের শেষ করিলেন!—এলাহিজান শোক বিম্বলা—তাঁহার মাতাও একে পীড়িতা, আবার শোকে আচ্ছন্ন, স্বামীর মৃত্যুর তিন দিন পরে তিনিও শোকের শান্তি কবিলেন,—এলাহিজান পিতা মাতার বিচ্ছেদে জগৎ শূন্য দেখিতে লাগিলেন,—তখন এলাহিজানই তাহার পিতার অন্তঃ

বিভবের অধিকারিণী, কিন্তু তাহার পিতৃ-বন্ধু ছলনা-জাল বিস্তার করিয়া সকল বিষয় স্বায়ত্ত্ব করিল, এবং এলাহিজানকে আপন অন্তঃপুরে সামান্যভাবে বন্দিণীর ন্যায় রাখিল। তখনও এলাহিজানের অন্তর হইতে আবদুলের প্রাণ অস্তর্হিত হয় নাই,—তিনি তাঁহার পিতার বিশ্বাসী বন্ধুর আচরণ বুঝিতে পারিয়া আবদুলকে একমাত্র আত্মীয়বোধে বারংবার পত্র লিখেন, কিন্তু আবদুলও স্বীয় জনকের মৃত্যুতে টৈপত্রিক বিষয় রক্ষার জন্য বিদেশে থাকায় একখানিও পত্র পান নাই,—এলাহিজান পিতৃ-বন্ধুর চাতুরি ও তাহার কারণ, আবদুলের পত্র না পাওয়ায়,—আবদুল তাঁহাকে ভুলিয়াছেন,—সুতরাং জগতে তাঁহার আর কেহ আত্মীয় নাই,—ইত্যাদি বোধে নিরন্তর অশ্রু-বর্ষণেই কালান্তিপাত করিতে লাগিলেন।

বিশ্বাসঘাতকের ফল ফলিল;—এক দিনে হয়, এক বৎসরে হয়, যত দিন পরেই হউক না কেন, পাপের ফলই ফলে, এই বাক্যের স্বার্থকতা হইল। পাঠক,—আজ দেখিতেছ;—পাপাচারী নারীহত্যাকারী সুখে কালযাপন করিতেছে,—জীবিত থাকিলে কিছু দিন পরে দেখিবে তাহার কি অবস্থা হয়, পাপের পরিণাম ভয়ানক! ইহ জগতে এক দিন না এক দিন ফলিবেই ফলিবে! এলাহিজানের পিতৃবন্ধুর সেই সময় উপস্থিত হইল! এলাহিজানের পিতৃবন্ধুরাজ-বিদ্রোহী অপরাধে দিল্লীশরের আদেশমতে সপরিবারে আমেদের কারাগারে প্রেরিত হইল, তথাপি এলাহিজানের সুখসুখ্যা উদয় হইল না। তিনি সামান্য পরিচারিকার ন্যায় আমেদ সাহের অন্তঃপুরে প্রেরিত হইলেন। এলাহিজানের দিন দুঃখেই যায়!—কিন্তু “চরম দুঃখের অবসানেই সুখ”—এই বাক্যের স্বার্থকতা জন্যই হউক বা এলাহিজান সৌন্দর্য্য রমণী রত্ন, রত্নের প্রকৃত

তেজেই হউক, আমেদের তাঁহার উপর চক্ষু পড়িল! যদিও আমেদের অন্তঃপুরে রমণীর অভাব নাই,—কিন্তু কাম-প্ররমিত তৃপ্তি কিছুতেই হয় না : আমেদ এলাহিজানকেও প্রণয়িনী শ্রেণীভুক্ত করিলেন! কিন্তু এলাহিজানের অন্তর তাহাতে কিছুমাত্র সুখী হয় নাই, তিনি বাহ্যিক চঞ্চল ও আমোদ-প্রিয় ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তর এক দিনের জন্যও দীর্ঘ সুখ ভোগ করে নাই! এ সময়েও তিনি আবদুলকে বিস্মৃত হন নাই, দৈবক্রমে আবদুল প্রধান ওমরাহ ও সেনাপতির পদে অভিষিক্ত হইলেন, এই কারণেও এলাহিজানের সহিত আবদুলের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ শুনিতে পাওয়ায় এবং নূতন প্রণয়িনী এলাহিজানের মনস্তৃষ্টি সম্পাদনের জন্য আমেদের আত্ম-ক্রমে মধ্যে মধ্যে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটিত! যদিও আবদুলের অন্তর তখন কখন কখন যৌবন-সুলভ কাম-প্ররমিতে লিপ্ত হইত, কিন্তু আমেদের প্রণয়িনীবোধে সে প্ররমিতকে দমন করিতেন, সুতরাং প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব বা মিত্রত্বের অন্তর অন্য কোন প্রকারে কলুষিত হয় নাই, অথচ উভয়েই উভয়ের প্রতি আশঙ্ক! এলাহিজানও তাহা প্রকাশ করিতেন না! এক দিন আবদুল ব্যঙ্গ স্বরে বলিয়াছিলেন,—“বেগম,—আমাকে দাস বলিয়া মনে রেখ!” এলাহিজান তত্ত্বতরে নমিলেন,—“সে মনে থাকুক আর নাই থাকুক, আমার মন মিত্র-স্তর বলে,—“আবদুল আমার প্রিয় ভ্রাতা!” “যেহুদী হউক,—তবে আমায় ভাল বাস?” আবদুলের স্মিত বদনের এই প্রশ্নে এলাহিজানও অস্পষ্ট হাসিয়া বক্রিমকন্দরে সজ্ঞা ভাবে মুহূর্ত্তে বলিলেন,—“আমি জানি না!”

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

কারাগার! অদৃষ্টের এই পরিণাম ?

“যদৈবেন ললাটপত্র লিখিতং তৎপ্রোজ্জ্বাতুং কঃ ক্ষমঃ ।”

প্রিয় পাঠক,—আপনাকে অনেকক্ষণ বিরক্ত করিয়াছি, গত পরিচ্ছেদে আবহুলের ইতিবৃত্ত পাঠে আপনি কি বিরক্ত হন নাই? যদি আপনি প্রকৃত বৈরাগ্যশালী হইবেন, তবে বিরক্ত না হওয়া সম্ভব বটে, যেহেতু পূর্ব পরিচ্ছেদের সত্তি এই আখ্যায়িকার অবশ্যই বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যাহা হউক পুনরায় রণজয়ের অনুসরণ করা যাউক, আমাদের নায়কের পরিণাম কি? দেখিতে হইল!

পূর্বেই জানা আছে, রণজয় কারাগারে, যে প্রাসাদে পূর্বে তিনি ভীক্স-স্বভাবা রমণীগণের উদ্ধারার্থ বাত্র হইয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি সেই প্রাসাদের এক দেশের একটি কুটিরে মুচ্ছাবস্থায়, তখন তাঁহার প্রকৃত কারাবাসীর ন্যায় সজ্জা হয় নাই, একখানি সামান্য খটায় পরিষ্কৃত শয্যোপরি রণজয় শয়ান, আহা,—অদৃষ্টের কি পরিণাম! কে জানে? রণজয় যে বন্দী তাহা কি তিনি জানিতে পারিয়াছেন? মহাকবি কালিদাস মদন ভাষা সময়ে রত্নির মুচ্ছা যেমত উপকারের বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, রণজয়ের পক্ষেও সেই রূপ, যে রণজয় সদম্ভে বলিয়াছিলেন,—জীবিত থাকিতে বন্দী করিতে পারিবে না, যে মহারাষ্ট্রীয়েরা নিরস্ত্র শব্দে জলিয়া উঠে, তাহার কুল-গৌরব আমাদের গৃহে বন্দী! হঠাৎ এ শব্দও রণজয়কে আকুলিত করিত সন্দেহ নাই। একজন মুসলমান সৈনিক রণজয়ের নিকটে, মুখে জল সিঞ্চন করিতেছে, চক্ষুদ্বয় ধৌত করিয়া দিতেছে, রণজয়ের মস্তকে উষ্ণ শোণিত কিছু শীতল হইতে লাগিল,

জ্ঞান যজ্ঞারের পূর্বভাবস্বরূপ হস্ত দৃঢ়-মুষ্টি করিলেন, এই সময়ে একজন সৈনিকসহ এক দীর্ঘশ্মশ্রু গম্ভীর আকৃতি সোম্য দর্শন মুসলমান গৃহে প্রবেশ করিল। সিঞ্চনকারী কুণ্ঠিত ভাবে অভিবাদন করিয়া বলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে। আগন্তুক বলিলেন “না জলসিঞ্চন কর!” সে পূর্বমত কার্য করিতে লাগিল। উভয়ে রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলেন, আগন্তুক সৈনিক বলিলেন,—“হাকিমজি! জাদনের আশা আছে!” অপর আগন্তুক উত্তর করিলেন,—“প্রাণের আশঙ্কা নাই, কোন স্থানে প্রাণ হানিকর আঘাত হয় নাই, তবে মুজ্জ্বীই অধুনা প্রবল!” দ্বিতীয় আগন্তুক হাকিম, তিনি এট কথার অবস্থানে সেবাকারীকে ভিজ্ঞাণা করিলেন,—“সকল ক্ষত ও আঘাতের স্থানে নীতিমত ঔষধ দিয়া বান্দা হইয়াছে তো? ইহার মধ্যে কোন অবস্থায় পরিবর্তন হইয়াছে? না যে অবস্থায় দেখিয়াছ,—এখনও সেই অবস্থা?” সেবাকারী উত্তর করিল,—“সকল স্থানেই যথাযোগ্য ঔষধ দিয়া দাঁড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, আমি যাহা দেখিয়াছি, আর সেই অবস্থাকেই আছেন, কেবল মধ্যে একবার হস্তদ্বয় দৃঢ়মুষ্টি বদ্ধ হইয়াছিল।” হাকিম আগন্তুক সৈনিককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—“তবে মুজ্জ্বী অচিরেই মর্য হইবে,—এক্ষণে এক মাত্রা ঔষধ সেবন করাও!” সেবাকারী এক মাত্রা ঔষধ দিয়া রণজয়ের মৃদু-বাদান করিয়া ঢালিয়া দিল! ঔষধ অধিকাংশই ছুই কল বহিয়া পাড়িয়া গেল! আগন্তুক সৈনিক হাকিমকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন। রণজয় অম্প অম্প চাহিলেন! তাঁহার পূর্ব স্মৃতি প্রায় লোপ হইয়াছিল! অনেকক্ষণ বিস্ফারিত নয়নে হাকিমের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন! হাকিম ভিজ্ঞাণা করিলেন, “এখন আছেন কেমন?” রণজয় তাঁহার উত্তর

না দিয়া সেই ভাবে হাকিমের মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া মুহূর্ত্তের প্রশ্ন করিলেন,—“আমি কোথায়?” “সে কথা ক্ষণপরে শুনিত পাইবেন!”—হাকিমের এই উত্তরে অনামনস্ক হইলেন! অনেক ক্ষণ পরে পূর্ক্ণ স্মৃতি তাঁহাকে আক্রমণের চেষ্টা করিল! তিনি সেই বিস্ফারিত নেত্রে উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল আরক্ত, শিরা সমূহ স্ফুট! ক্ষণপরে পুনরায় হাকিমকে বলিলেন,—“আপনি কে?” হাকিম অতিবিচক্ষণ, তিনি মনে স্থির জানিয়াছিলেন,—রোগী স্থায় অদৃশ্য জানিতে পারিলে নিতান্ত কাতর হইবে, একপ অবস্থায় অধিক কাতর হইলে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবন, সুতরাং তিনি বলিলেন,—“উদ্বিগ্ন হইবেন না, ক্ষণপরে জানিতে পারিবেন, আপনি পীড়িত, আমি চিকিৎসক!”—“আ-মি-পী-ড়ি-ত,-চি-কি-ৎ-স-ক!! আ-মি-কো-থা-য়?” রণজয়ের মুখ হইতে এই কয়েকটি কথা সবিচ্ছেদে মুক্ত হইয়া উচ্চারিত হইল! হাকিম বলিলেন,—“আপনি কোথায়?” “এক্ষণে জানিবার অপেক্ষা নাই! পরে স্বতঃই জানিতে পারিবেন!” রণজয় তাহাতে দ্বিভুক্তি করিলেন না, তাঁহার পূর্ক্ণ স্মৃতি তাঁহাকে আকুলিত করিল, মুখ আরক্ত অথচ মলিন হইয়া উঠিল! হাকিম পার্শ্বস্থ অনুচরের প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—“আর এক মাত্রা ঔষধ দেও!” সে ব্যক্তি ঔষধ লইয়া রণজয়ের মুখের নিকট গিয়া বলিল,—“ঔষধ সেবন কর!”—“ঔষধ!—তোমরা যবন, যবনের সংস্পর্শ জল!” সেবাকারী বিরক্ত স্বরে বলিল,—“যবন এখন তোমার প্রভু!”—হাকিম তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—“ঔষধে দোষ কি?—আমি অনেক হিন্দুর চিকিৎসা করিয়াছি,—তাঁহাদের নিকট শুনিয়াছি,—ঔষধার্থে—যাবানিক অশন ও পান আপনাদিগের ধর্ম্ম বিরুদ্ধ নহে!”—“হাঁ ঔষধ!—

ইহাতে কি উপকার হইবে?—আমার জীবন এক্ষণে মূল্যবান নহে!”—রণজয়ের এই উত্তরে হাকিম কহিলেন,—“মহাশয়, আত্মহত্যার ইচ্ছা,—ইহাতো আপনাদিগের ধর্ম্মের অনুমত নহে!—আপনি মহাত্মা ধার্ম্মিক, আপনার এ কি কথা?”—“সত্য,—কিন্তু জীবনে ভার বোধ হইলে আত্মহত্যাও অভীষ্ট হইয়া উঠে,—যাক,—আপনাকে বিরক্ত করা আমার ইচ্ছা নহে, কিন্তু মহাশয়,—এ ঔষধ সেবনে আমার কি উপকার হইবে!” রণজয়ের কথাবসানে হাকিম বলিলেন,—“ধার্ম্মিক বল-বৃদ্ধিই এ ঔষধের শক্তি!”—“বল”—রণজয় আন বিকৃত্তি না করিয়া “দেও”—বলিয়া সেব্যকারীর হস্ত হইতে ঔষধ লইয়া পান করিলেন। হাকিম পুনরায় কহিলেন,—“কিছু থাইতে ইচ্ছা হয়?”—“তুকা, জল—না মহাশয়,—আপনি বোধ হয় জানেন,—আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে যবন-সংস্পর্শ দ্রব্য থাইতে নিষেধ!”—রণজয়ের এই কথায় হাকিম বলিলেন,—“আমি বিশেষ জানি। যদিচ আমি তোমাদের ধর্ম্মাক্রান্ত নহি, কিন্তু আমি হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষীও নহি, যে স্বধর্ম্ম-চ্যুত, আমার মতে সেই কাকের! আমাদের এখানে এক জন হিন্দু আছে, তাহার দ্বারা পানীয় আনিয়া দিতে পারি!” রণজয় কৃত জ্ঞতার সহিত হাকিমের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। হাকিম পার্শ্বস্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করায় সে তৎক্ষণাৎ বাহিরে গেল। সেই সময় রণজয় হাকিমকে বলিলেন,—“মহাশয়, এ পর্য্যন্ত আমি আপনার ন্যায় সুধার্ম্মিক মুসলমান দেখি নাই, বলিতে কি,—যবন মাত্রই হিন্দু-ধর্ম্ম-বিদ্বেষী, এই কুসংস্কার আজ আমার অন্তর্হিত হইল! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—আমার জীবনে শত্রুর প্রয়োজন?”—“তাহা আমি জানি না”—হাকিমের এই কথার অবসরেই একজন সৈনিকসহ সেই পরিচারক পূর্বা-



ভাস্করে প্রবেশ করিল।—সৈনিকের হস্তে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ও পানীয়! তাহার আকারাদি দর্শন মুসলমান বলিয়াই বোধ হয়, যেহেতু আমাদের অন্যান্য সৈনিকের ন্যায় তাহার পরিচ্ছদ! সে ব্যক্তি রণজয়ের নিকটস্থ হইয়া বলিল,—“জল পান করুন!” রণজয় তাহার মুখে সন্দেহ-ময় দৃষ্টিপাত করিলেন। হাকিম বলিলেন, সন্দেহ করিবেন না, জিজ্ঞাসা করুন! রণজয় আগন্তুককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—“আপনি কি হিন্দু?” “হাঁ—আমি হিন্দু ব্রাহ্মণ, নাম গঙ্গাকিষন!” সৈনিকের এই কথায় রণজয় জল গ্রহণ করিবার কারণ কষ্টে বাম হস্ত বাহির করিলেন,—সে ব্যক্তি কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন দিল;—রণজয় তাহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় হাকিমের অনুরোধে তাহা খাইয়া জলপান করিলেন। হাকিম বলিলেন,—“আমি আমি!” রণজয় তাহাতে উত্তর করিলেন না। হাকিম ও পরিচারক চলিয়া গেলেন। কেবল গঙ্গাকিষন হাকিমের অনুমতি মত গৃহে রহিল। রণজয় মূছুরে বলিলেন,—“উঃ,—কি ভয়ানক ভ্রম!”—গঙ্গাকিষন বলিল,—“আর জল আনিয়া দিব, রণজয় বলিলেন,—“দেও!” সেও চলিয়া গেল। রণজয় একাকী, এদিক্ ওদিক্ চারিদিক দৃষ্টিপাত করিলেন,—দেখিলেন,—গৃহদ্বারে অস্ত্রধারী সৈনিক পরিভ্রমণ করিতেছে! তিনি মূছুর অথচ আকুলিত স্বরে বলিলেন,—আমার জীবনে ইহাদিগের যত্ন কেন?—আমার জীবনে বধ্যভূমি রঞ্জিত করিবে এই কি উচ্ছা? শৃগাল কুকুরের ন্যায় বধ্য হইবে? মৃত্যুকালে কি এক জন শত্রুরও রক্ত দেখিতে পাইব না? স্বাধীন জীবন কি অধীন ভাবে যাইবে? আমার অভাবে কি সুবর্ণ দুর্গের স্বাধীনতা যাইবে? মহারাক্ষসীয়েরা—হিন্দুরা—আর্য্যবংশীয়েরা কি বিধর্মী মুসলমানদিগের দান হইবে? কুসুমিকা,—তোমার

কি হইবে ? জন্মের মত তোমার সাহিত্য সাক্ষাৎ ঘুচিল । আগ্নি  
জীবনে আমাদের কাবাগারে বন্দী ! হায়,—আমার অদৃষ্ট ! এই  
অদৃষ্টের পরিণাম ?”

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

নামুদ ও রণজয় ;—বন্ধ । “রাজ গুল্লের মৃত্যুর ভয় কি ”

“বরং মহত্যা ত্রিয়তে—

তথাপি নাশস্ত্য করোত্যাপাসনাং ।”

রণজয়ের এ অবস্থা দেখিয়া কোন্ বন্ধ-বাদী আর স্বাধী-  
নতার নাম করিবে ? যদি কখন কাহারও অন্তর স্বাধীনতা-  
প্রিয় হয়, আমাদিগের উচ্ছিন্ন করা অকর্তব্য । প্রিয় পাঠক,-  
তুমি কি পরের মন্দ দেখিতে ভাল বাস,—অনেকের সম্ভাব  
এই যে, পরের অনিষ্ট দেখিলেই অতুল আনন্দ ভোগ করে,  
আপনি যদি সেই স্বভাবের লোক হয়েন, তবে গত পরিচ্ছেদে  
আপনাকে সন্তুষ্ট করিয়াছি,—আমাকে পারিতোষিক দেও !  
আমার এ গ্রন্থ লেখা দেখিয়াও বোধ হয়, আহ্লাদিত হইয়া  
থাকিবেন, কারণ এততো কতক আমার অনিষ্ট ! পাঠক,—  
আপনি যদি পরের দুঃখে কাতর হয়েন, তবে গত পরিচ্ছেদে  
আপনার দুঃখোৎপাদন করিয়াছি,—কি করিব ভাই ! আমরা  
নবোপাখ্যানকে যখন অবতরণ করিয়াছি,—তখন শেষ করিতে  
চেষ্টা করিব । আমাদের এ আশা নাই যে, লেখার ভায়ে  
কাহাকেও হাঁসাইব,—কাঁদাইব,—উত্তেজিত করিব ! আমা-  
দের এই নবোপাখ্যান যাহা করে, এ কেবল তাহার  
ঘটনা ! অনেককে সামান্য কথায় ক্ষুব্ধ হইতে, আহ্লাদিত

হইতে ও উত্তেজিত হইতে দেখিয়াছি,—সেই আমাদের ভরসা !

গঙ্গাকিষন জল আনিল, রণজয় জলপান করিয়া কতক সুস্থ হইলেন । তিনি গঙ্গাকিষণের মুখে তাজ্জীল্যভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া মুছস্বরে বলিলেন,—“ঠাকুরজি,—তুমি আৰ্য্য-কুল-সম্মত হইয়া কিরূপে যবনের দাসত্ব স্বীকার করিলে ?” গঙ্গাকিষণ রণজয়ের মুখে সত্যঃ দৃষ্টিপাত করিল,—তাঁহার চক্ষু বিস্ফারিত ও সজল হইয়া উঠিল । দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—“যবনের দাস,—হিন্দু-ব্রাহ্মণ যবনের দাস. সময়. অদৃষ্ট,—পাপের পরিণাম!—কে অন্যথা করিবে ?”—রণজয় এই উত্তরে বিস্মৃত হইলেন, সেই সময়ে সে-ই পূর্ব পরিচারক প্রবেশ করিল । গঙ্গাকিষণ তাঁহাকে দেখিয়া রণজয়ের মুখে একপ ভাবে দৃষ্টিপাত করিলেন, যে রণজয় সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে এ কথার আন্দোলনে তাহার নিষেধ ! সে আসিয়া গঙ্গাকিষণকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—“তোমার আর থাকিবার প্রয়োজন নাই !”—গঙ্গাকিষণ চলিয়া গেল ! সে ব্যক্তি প্রবেশের অব্যবহিত পরেই রণজয় দেখিলেন, কতিপয় সহচর সহ-মামুদ সহাস্য আশ্রয়ে গৃহে প্রবেশ করিলেন । মামুদের একজন সঙ্গী উপহাস-মুচক স্বরে বলিল,—“আছ—কেমন ?—মুসলমানের প্রতি তোমার বড় ঘৃণা । জান এখনও তোমার প্রতি মুসলমানেরা যথেষ্ট সততা করিয়াছে, এ সততা তোমার দুর্ভতার ফলের প্রয়োজক, তোমার শোণিতে বধ্য-ভূমি রঞ্জিত হওয়াই আবশ্যক, রণক্ষেত্র দিল্প হইলে কনকনের কলঙ্ক হইত !” কি ? মুসলমানের সততা,—যবনের সততা ! মহারাক্ষীরে—বিধর্মী যবনের সততার প্রার্থনা করে না, মহারাক্ষীরে যবনের ন্যায় মৃত্যুতে কাতর নহে !”—

রণজয়ের এই সদস্ত উক্তির অসমাপ্তিতেই মামুদ সহানু আছে বলিলেন,—“ও কথা ছেড়ে দেও, যদি জীব নর ইচ্ছা থাকে নত হও, তোমাদের কর্তৃক অগ্ৰহৃত সম্পত্তি সুবর্ণ-চুর্ণে ও শুভাগ্রার হইতে রাজকোষে অর্পণ কর,—আমেদ রাজের পদানত হও!”—রণজয় মামুদের কথায় বাধ্য দিয়া ভয়ঙ্কর উদ্বেজিত স্বরে বলিলেন,—“পূর্বেই বহিয়া'ছ,—মহারাক্ষীয়েরা হৃত্যকে ভয় করে না, অগ্নি বিধম্মীর পদানত!—আজ যদি আমার হস্ত নিরসি না হইত, তবে জানিতে এক্ষণ বস্ত্রের রসনা শীঘ্রই ভূমি স্পর্শ করিত,—তোরা না বীরদের স্মরণ করিস—যদি বীর বলিয়া মনে অভিমান থাকে,—এমনো আনাকে অসি আনিয়া দে, তোরা অসি ধর,—বুদ্ধে আনাকে বধ কব!—প্রাণের লোভ ভীষ্মের নিকটে দেখাস্,—এই সকল বলিতে বলিতে রণজয়ের মুখ আরক্ত ভয়াল হইয়া উঠিল। তিনি শয্যার উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন,—কিন্তু পদদ্বয় দুর্বল লৌহ-শৃঙ্খল বন্ধ, দক্ষিণ হস্ত নিতান্ত আঘাতিত, সুতরাং দুর্বল শিরকায় বন্ধ শার্দূলা শৃঙ্খলের উপহাসে যেমন উত্তেজিত, অথচ অক্ষম, রণজয়ও সেই মত। তাহার শরীর কাঁপিতে লাগিল,—দক্ষিণ হস্তের ত্র্যম্বক-বেঠান-বস্ত্র ভেদ করিয়া শোণিত দেখা দিল! মামুদ তাচ্ছীয়া হইয়া বলিলেন,—“হতভাগ্য,—তোরা মৃত্যু নিতান্তই নিকট, দুর্ভাগি মাটীয়াছে, আমি আমেদ সাহার নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া তোরা প্রাণনাশাজ্ঞার পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দিতে পারিতাম, তুই রাজদ্রোহী দস্যু বটে, কিন্তু তোরা অসমবাহন ও যুদ্ধ শক্তি দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তোরা প্রাণ রক্ষার জন্য নিতান্ত ইচ্ছা জন্মিয়াছিল, তোরা ছরদৃষ্ট তাহার প্রতিবন্ধক!”—“বাধ্য হইলাম, যথেষ্ট অনুগ্রহ!”—রণজয় ব্যঙ্গ

স্বরে এই কয়েকটি কথা বলিয়া পুনরায় সদন্ত রাগ-স্বরে বলিলেন,—“বিধব্রী, তোদের অন্তর ভীৰু,—বাহ্যিকই কেবল বীরতা!—নচেৎ প্রাণ রক্ষার লোভ দেখাইয়া মহারাক্ষীরে নিকট সততা দেখাস,—তোদের ঘাতুককে ডাক, রণজয় মৃত্যুকে ভয় করে না, এক রণজয়ের অভাবে সুবর্ণ দুর্গ অধীনতা স্বীকার করিবে না, এক জন মহারাক্ষীর থাকিতে কখনই সুবর্ণ দুর্গের স্বাধীনতা যাইবে না!”—“দস্যু,—তোর অন্তর বীরের উপযুক্ত বটে; কিন্তু এখন চরমকাল, ঈশ্বরের নাম স্মরণ কর, কালই তোর পাপের রাজ-বিদ্রোহিতার কল ফলিবে”—“এই কয়েকটি কথা বলিয়াই মামুদ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন,—বাহিরে যাইবার সময় একজন পার্শ্বস্থ অনুচরকে সঙ্কেত করিয়া গেলেন,—মে রণজয়ের হস্তে লৌহ শৃঙ্খল আবদ্ধ করিবার জন্য নিকটস্থ হইয়া রণজয়ের হস্তধারণ করিবা মাত্র তিনি বামহস্ত বলপূর্বক ছাড়াইয়া লইলেন,—কিন্তু তৎক্ষণাৎ আরও আট জন অনুচর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত! রণজয় দেখিলেন,—আর বল প্রয়োগ ব্যথা!—সুতরাং সহজেই হস্তদ্বয় বদ্ধ করিতে দিলেন,—বদ্ধ হইলে সকলেই গৃহ হইতে বাহিরে গেল,—কারাগারের দ্বার বদ্ধ হইল, চাবির শব্দ!”

রণজয় চারিদিক্ দেখিলেন,—“আনি কারাগারে,—যা ভাবিয়াছি, তাহাই ঘটিয়াছে!—আমার অনুচরবর্গ বিদেশে শত্রু-ব্যাহে প্রভুবিহীন হইয়া মারা পড়িল! সুবর্ণ-দুর্গ, এত দিনে বুঝ তোমার স্বাধীনতা গেল! ছুরাত্মা যবন আমেদ সুবর্ণদুর্গের অধীশ্বর হইবে,—যবনে মহারাক্ষীর স্বাধীনতা নষ্ট করিল! কাল,—তোর এই কি আন্তরিক ইচ্ছা! তিনি ক্রমশঃ অবশ হইলেন, যবন--ছুরাত্মা যবন সুবর্ণ-দুর্গ অধিকার করিবে,

রাজপুত্র অবলাগণ পাপাচারী বিধব্রী বন্দিনী হইবে,—  
কুসুমি”—রণজয়ের কণ্ঠবাষ্পে রুদ্ধ হইল, দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ  
করিলেন, বন্দিনী—কুসুমিকা বন্দিনী—না—সতীর জীবন  
থাকিতে যবন স্পর্শ করিতে পারিবে না ; আমি পামর, স্ত্রী  
হত্যার ভাগী ! কেন কোমল! কুসুমিকাকে অজ্ঞানাবস্থায়  
কেলিয়া আমিসাম! কেন সুবর্ণ-ভূগে থাকিয়া সমরোদ্দোগ  
করিলাম না ? কেন অমদমাহনে শত্রুদলে প্রবেশ করিলাম ?  
উঃ—মদনের ককশ উন্মিত শুনিয়া তাহার মস্তক ভূতল স্পর্শ  
করাইতে পারিলাম না !—এখনও কি কুসুমিকার জীবন আছে,  
ঈশ্বর যেন মৃত্যুকালে আনাকে কুসুমিকা স্মরণ করাইয়া অশ্রু-  
পূর্ণ নয়ন করাইও না, —এই দক্ষ-হৃদয়ের পাপীর শেষ ভিক্ষা,—  
দেখ,—যেন সর্বত্র প্রচার হয়,—“মহারাক্ষীর মৃত্যুর ভয়  
কি ?” চিরকাল যেন মহারাক্ষীরদিগের হৃদয়ে অঙ্কিত থাকে,—  
“মহারাক্ষীর মৃত্যুর ভয় কি ?” জগতে যেন চিরকাল প্রতি-  
শ্রবিত হয়,—“মহারাক্ষীর মৃত্যুর ভয় কি ?”

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

পত্রা।———“ছি আমার আশা ।”

“তুমি শো নোবাশ কিম্ব পরমতো নর্ত্তয়সি মাং ?”

“জগতে সুখী কে ?” এ প্রশ্ন করিলে নিরন্তর পরিজন-  
পালনাশক্কে দরিদ্র বলিবেক,—ধনী, নানা যন্ত্রণাক্লিষ্ট রোগী  
বলিবেক,—নিরাময় ব্যক্তি ! আত্মীয়-বিচ্ছেদ-তপ্ত শোকী  
বলিবেক,—অশোক প্রাপ্ত ! বিলাসেচ্ছ নিঃস্ব বলিবেক,—

মধুকর-নিকর-চুমিত সুগন্ধি-কুসুমিত লজ্জাপগুট-আরাম-গৃহ-  
স্থিত গণিক-জন-পরিবৃত্ত সুরস সুরা-সেবিত বাবু! নিরন্তর  
ধর্ম-সন্ধিৎসু বলিবেক,—ধর্মাত্মা যোগী! যেই বাহা বলুক  
না কেন,—আমাদের মতে ভাষ্যার অকৃত্রিম প্রণয়ই সকল  
সুখের নিদান! যে সে সুখ ভোগ করিয়াছে,—সেই জানে!  
প্রেমসী ললনার মধুর হাঁসি,—চটুস চাঁকু-চক্ষু ভঙ্গি, প্রেমময়  
আলিঙ্গন,—যে ভোগ করিয়াছে, সেই জানে,—জগতে সুখ  
কি? অকৃত্রিম প্রেম, মধুর শাস্ত্রমূর্তি রসময় প্রেম! যে প্রেমে  
রবুকুল তিলক রামচন্দ্র আচ্ছন্ন,—সেই অমূল্য প্রেম! প্রিয়  
পাঠক,—কখন সে প্রেম সে সুখ ভোগ করিয়াছ? যদি সে সুখ  
ভোগ করিয়া থাক,—তবে তুমিও আমার মতের পক্ষপাতী!  
যদি সে প্রেম সে সুখ না ঘটিয়া থাকে,—তুমি তবে কখনই  
প্রকৃত সুখের মুখ দেখে নাই! আমাদের নায়ক রণজয় সে সুখ  
ভোগ করিয়াছেন,—চরম সুখের অবসানে দুঃখ আছেই  
আছে,—যে রণজয় নিষ্ঠুরতার দাস হইয়া যুদ্ধের পক্ষে কুসুম-  
মালা বিসর্জন করিয়া ছিলেন, আজ কিন্তু সেই কুসুম-মালা  
হৃদয়ে কল্পনার সহযোগে সরোদনে গ্রহণ করিয়াছেন।

রণজয় কারাগারে প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা তাঁহার অদূরবর্তী;—  
হস্ত পদ দুর্ব্বল লৌহ-শৃঙ্খলাবদ্ধ, তাঁহার যদি সেই মুচ্ছা ভঙ্গ  
না হইত তবে আর এ সকল কষ্ট ভোগ করিতে হইত না,—  
অনেকে এইরূপ অবস্থায় পড়িলেই বলে,—কষ্ট ভোগের  
জন্যই মনুষ্যের দীর্ঘ জীবন! রণজয়ের মৃত্যুর ভয় নাই,—  
বীর-পুরুষের মৃত্যুভয় কোথায়? তিনিতো মৃত্যুকে অগ্রসর  
করিয়াই কনকনে প্রবেশ করিয়া ছিলেন,—তবে তাঁহার অন্তর  
কাঁপিতেছে কেন? চক্ষু আরক্ত সজল কেন? রণজয় কি  
কাঁদিয়াছেন? তাঁহার কি “মহারাক্ষীর মৃত্যুর ভয় কি?”—

এই সদন্ত উক্তি স্মরণ-শক্তি হারাইয়াছে? না,—রণজয় এতো  
 প্রাণের জন্য কাতর নয়,—কুসুমিকা! যে কুসুমিকা এত দিন  
 তাঁহার হৃদয়কে আনন্দরসে পরিপ্লুত করিয়াছিল,—সেই কুসু-  
 মিকাই কষ্টের কারণ! যিনি অদৃষ্ট না মানেন মানুন, কিন্তু  
 আমরা বলি,—অদৃষ্ট প্রত্যেক পদে পদে প্রতীয়মান, যে  
 গাণ্ডীব ধনু এক সময়ে কুন্তী-হৃদয়-নন্দন মহাবীর অর্জুনের  
 অতুল আনন্দ-প্রদ একমাত্র অবলম্বন ছিল,—সেই গাণ্ডীব  
 ধনুঃই এক সময়ে সেই গাণ্ডীবী খাত বীরবর অর্জুনের বিষম  
 তার বোধ হইয়াছিল। আজ রণজয়ের পক্ষে সেই রূপ, তিনি  
 এক্ষণে বীর-পুরুষোচিত সুবর্ণ-ভূর্গের স্বাধীনতা নষ্টের দুঃখ  
 বিস্মৃত হইয়াছেন, কুসুমিকার মোহিনী-মূর্তি সেই আলু-  
 লায়িত বৃন্তলদাম, আরক্ত-শজল-নয়ন-সুশোভিত সুচারু বদন  
 মণ্ডল হৃদয়ে অঙ্কিত,—যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই  
 মোহিনী-মূর্তি! তাঁহার পুষ্পের প্রেম মধুর আলাপ স্মরণ হইতে  
 লাগিল! এখন তাঁহার চিরকালের অভ্যন্ত গম্ভীর ভাব একে-  
 বারে অন্তর্হিত হইয়াছে, তাঁহার ধৈর্য্যাবরণ প্রবল-বাতায়  
 দূরগত হইয়াছে, তাঁহার রসনা অস্পষ্ট স্বরে বারংবার—“কু-সু-  
 মি-কা—কু-সু-মি-কা”—শব্দ সবিচ্ছেদে উচ্চারণ করিতেছে!  
 রণজয়কে যদি সে সময়ে কেহ জিজ্ঞাসা করিত,—দূর্য্য উদয়ে  
 তুমি কালকবলে নিপতিত হইবে, তুমি ইষ্ট দেবতার নাম  
 স্মরণ করিতেছ কি,—ছি,—কুসুমিকা কি তোমার ইষ্ট  
 দেবতা?”—রণজয় বোধ হয় বলিতেন,—স্বর্ণ প্রতিমা প্রেমময়ী  
 কুসুমিকা ব্যতীত এ সময়ে আমার অন্য স্মরণীয় দেখি না!  
 তাঁহার একমাত্র হৃদয় কুসুমিকার চিন্তাতেই পূর্ণ,—আর  
 অন্য চিন্তা আসিলেই বা স্থান পায় কোথায়?—তিনি সকল  
 চিন্তা বিস্মৃত হইয়া কেবল কুসুমিকার চিন্তাতেই রত।—



“বন্দিনী,—যবনের হস্তগত। মহারাজ্যীয় রমণী যবন-কর-স্পর্শিতা। উঃ—কি ভয়ানক, শৈলেশ! তুমি কি জীবন থাকিতে অবলাগণকে যবনের হস্তে সমর্পণ করিবে?—সমর কি জীবিত,—তুমি কি জীবনে আমার ন্যায় শত্রু ভবনে বন্দী! এ সংবাদ কি সুবর্ণ-চূর্ণে পৌছাবে না! সতীর জীবন কতক্ষণ বিধবা অবস্থায় থাকিবে? শৈলেশ্বর,—সংবাদ পাইয়া থাকতো অগ্রসর হও, নারী-বধে ভয় করিও না, কুন্তমিকাকে সংবাদ দেও?—কেন কুণ্ঠিত হইতেছ?”

রণজয় যখন কপ্পনার সহযোগে এই সকল প্রলাপ উচ্চারণ করিতে ছিলেন, সেই সময়ে সূর্য্যদেব অরুণকে অগ্রসর করিয়া উদয়-পর্ব্বতের শিখর দেশে উত্তীর্ণ হইলেন, বাসন্তী রজনী নিষ্ঠুরভাবের পরাকার্তা দেখাইয়া কনকন হইতে পলায়নের উদ্যোগ করিতে ছিল, সময় কাহারও হাতে ধরা নয়, এ মূল্যবান বাক্য কখনই মিথ্যা নহে! ঐশ্বরের নিয়ম কে অস্থগ্য করিবে? মামুদ স্পষ্টই বলিয়াছিলেন,—রজনী প্রভাতে রণজয়ের প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা হইবে? সূর্য্যদেব কি রণজয়ের প্রাণ রক্ষার জন্য কিছু বিলম্ব করিতে পারিলেন? পতিপ্রাণা পোড়া সতী বিরহাস্তে স্বামি-সহবাসের সময়, চোরেরা চৌর্য্যকার্য্যের সময় যতই কেন দীর্ঘস্বামিনীর সূর্য্যদেবের অনুদয়ের প্রার্থনা করুকনা, সূর্য্যদেব যথা সময়ে উদয় হইবেনই হইবেন! ঐশ্বরিক নিয়ম কোন প্রতিবন্ধক গ্রাহ করে না! কারাগৃহের গবাক্ষে ভগবান্ মহত্ম রশ্মির কিরণ পড়িল, রণজয় চম্কাইয়া উঠিলেন—“আর বিলম্ব নাই, এখন আমেদের দূত বধ্য ভূমিতে লইয়া যাইবার উদ্দেশে আসিবে, এখন কাতর হওয়া অকর্তব্য!—কুন্তমিকা, নিষ্ঠুর হৃদয় রণজয় জন্মের মত এ জীবনের মত তোমার নিকট বিদায় লইতেছে, তোমার সহিত

আর দেখা হইল না, চিরকালই তোমার সহিত নির্ভরতা করি-  
 য়াছে, কেন নবনীতবৎ কোমল হৃদয়ের সহিত পাষণ হৃদয়ের  
 প্রেম হইল? কুসুম,—কোন পাপে তোমার এমন নির্ভর  
 আশ্রয় হইল!”—“মৃত্যু,—আর বিলম্ব কেন? যাতনা অসহ্য!  
 প্রাণ একটু পূর্বে নির্গত হও! পাপদেহে থাকিতে আর ইচ্ছা  
 কেন? আমি কি তোর জন্ত কাতর হইব,—যখন কুসুমিকাকে  
 পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন তোরে পরিত্যাগ করিতে কাতর?  
 ছি,—মহারাক্ষীরের সকল যন্ত্রণা সহ্য, প্রাণের মায়া এ কথা  
 সহিবে না! তবে আমার চক্ষু অশ্রু বর্ষণ করিতেছে কেন?—  
 তবে হৃদয় কাঁপিতেছে কেন? কুসুমিকা,—শেষ অবস্থায়  
 কুসুমিকার মুখ দেখিতে পাইলাম না, সুবর্ণ ছুর্গের স্বাধীনতার  
 জন্য কোন উপায় করিতে পারিলাম না,”—হঠাৎ গবাক্ষ  
 হইতে এক খানি কাগজ পড়িল, রণজয় আবার চমকাইলেন,—  
 এ কি?—তিনি আস্তে আস্তে কাগজখানি তুলিয়া লইতে চেষ্টা  
 করিলেন,—কিন্তু উভয় হস্তই বদ্ধ, বহু কষ্টে পত্রখানি লই-  
 লেন! তাহাতে কয়েক ছত্র লেখা,—“জীবন রক্ষক! সহজে  
 তোমার জীবন যাইবে না,—হত্যাশাস হইও না। যে রমণীকে  
 তুমি মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছ, সে জীবন পর্যন্ত পণ  
 করিয়া তোমার জীবন-রক্ষার চেষ্টা করিবে!”—একবার দুই-  
 বার তিনবার পাঠ করিলেন,—এ কি!—আশা!—শত্রু-শিবিরে  
 কারাগারে প্রাণের আশা! এ পত্র কে কাহাকে দিলে! কারা-  
 গৃহে,—একমাত্র কারাবাসীর গৃহে আমাকে ব্যতীত কাহাকে  
 দিবে! স্ত্রীলোকের ন্যায় অক্ষর, যাহাদের অগ্নিকুণ্ড হইতে  
 উদ্ধার করিয়াছি,—তাহাদেরই এক জনের!—স্ত্রীলোকের  
 ছুরাভ্যা যবন আমেদের নিকট হইতে চিরশত্রু রণজয়কে উদ্ধার  
 করিবার আশা!”

পাঠক,—চির পরিতৃপ্ত হৃদয় মৃত্যু-প্রার্থী রণজয়ের মুখ দেখে, অগত মনোহারিণী মোহিনী আশা চপলার ন্যায় মধ্যে মধ্যে রণজয়ের মুখে ক্রীড়া করিতেছে! রণজয় আবার পত্র-খানি পড়িলেন!—“এখনও আমার জীবনের আশা, রমণীর দ্বারা জীবন লাভের প্রত্যাশা! আমি বীর,—আমি মহারাষ্ট্র-য়ের অধীশ্বর,—আমি মৃত্যুকে ভয় করি না, আমার আবার এখনও প্রাণের আশা,—“ছি আমার আশা!”

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

প্রেম-প্রকাশ ।—আমি তোমারি !

“ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং ।

কি মিহোত্তরেণ ?”

প্রিয় পাঠক,—কারাগারে আর কতক্ষণ থাকিবে?—চল,—একবার এলাহিজান ও আবদুলের কথোপকথন শুনিয়া আসি,—নবাবের বেগমকে যুবকের নিকট একাকিনী রাখিয়া আনিরাছি, চল,—তাহাদের ভাব ভক্তি দেখিয়া আসি ।

আবদুল এলাহিজানকে দস্যু-দলপতির বন্দী সংবাদে মলিনা দেখিয়া বিস্মৃত! আবদুলের অন্তর সংশয়ে নিমগ্ন হইল, তিনি এলাহিজানের মুখে সতৃপ্ত দৃষ্টিপাত করিলেন,—কিছু বলিবার ইচ্ছা,—ভরসা হয় না; সংশয়ে আকুলিত হইয়া বলিলেন,—“বেগম”—এলাহিজান আবদুলের কথার বাধা দিয়া ছঃখিত স্বরে বলিলেন,—“ভাই,—তুমি কি একেবারে সম্পর্ক ভুলিয়া গেলে? আমার কি তোমার বেগম সম্বোধন যুক্তি যুক্ত? আমার আর বেগম সম্বোধন করিও না!—” আবদুল এই কথায় কিছু কুণ্ঠিত হইলেন, তাহার হৃদয় দ্বি-

গুণতর সংশয়ে নিমগ্ন হইল। তিনি কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন,—  
 “আপনার সহিত সম্পর্ক সুতরাংই আমার ভুলিতে হই-  
 য়াছে!”—আবদুলের নয়ন সজল হইল,—একটু নিস্তব্ধ হইয়া  
 পুনরায় বলিলেন,—“যে দিন আপনি নবাবের হৃদয় অধি-  
 কার করিয়াছেন,—সেই দিনই আমার সুতরাং সব ভুলিতে  
 হইয়াছে, সেই দিনই আমি আশা বিহীন!”—আবদুল  
 আর কথা কহিতে পারিলেন না, তিনি সচকিত, স্তম্ভিত ও অপ্র-  
 তিভ! এলাহিজান বলিলেন,—“আবদুল, ভ্রাতঃ! নবাবের হৃদয়  
 অধিকার!-সময়,-অদৃট! যে সময়-যে অদৃষ্ট তোমার বিরূপে দক্ষ  
 করিয়াছিল, যে সময় যে অদৃষ্ট বিশ্বাস—ঘাতকের অন্তঃপুরে  
 বান্দনী করিয়াছিল, সেই সময় সেই অদৃষ্টই আগাকে আমেদের  
 প্রণয়িনীভুক্ত করিয়াছে! আশা-বিহীন!—এই কি তোমার  
 ভালবাসা?” “এলাহিজানের চক্ষুঃ হইতে অশ্রু জল পড়িল,—  
 আবদুল অবৈর্য্য হইলেন, তিনি ক্রমশঃ অগ্রসর,—স্নানবদনে  
 জিজ্ঞাসা করিলেন,—“ভগ্নি,—তবে কি তোমার অন্তর আমেদকে  
 ভাল বাসে না?”—“তাহা আমি বলিতে অক্ষম,—তুমি  
 বিবেচনা কর, তোমার নিরাশ অন্তঃকরণ বিবেচনা করুক।”—  
 এলাহিজান সেই স্নানমুখে একটু হাসিয়া এই কয়েকটি কথা  
 বলিলেন। উভয়ের চক্ষুঃ আফ্লাদে ভাসিল, উভয়ের নুখে  
 সংস্থাপিত হইল!—“আবদুল,—ভাই,—তোমার কি বালককালের  
 সে সকল কথা স্মরণ আছে?—বাটীর পশ্চাতেব সেই উপবনে  
 উভয়ে যখন কুসুম চয়ন করিয়া পরস্পর মালা গাথিয়া পরাইয়া  
 দিতাম, উভয়ে যখন একত্রে কুসুমের স্রাব লইতাম, যখন  
 লতামণ্ডপের শিলাপটে তোমার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া  
 তোমার স্নেহপূর্ণ মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া শয়ন করিতাম,—তখন  
 আমি যে রূপ আনন্দমাগরে ভাসিতাম,—তাহা স্মরণ আছে?

তুমি এখন কনকনের প্রধান ধনী,—পৈত্রিক ধনেই অতুল ধনের অধীশ্বর, কনকনের সর্ব সৰ্বা,—কনকনের অধিপতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না,—সুতরাং তোমার অন্তর আহ্লাদে মিরস্তর মঞ্চ,—তোমার মে সকল কথা স্মরণ না থাকিতে পারে, কিন্তু আমার সুখভোগ ফুরাইয়াছে, আমি সেই পর্য্যন্ত আর সুখের মুখ দেখি নাই,—আমার হৃদয়ে মে সকল কথা অঙ্কিত! আমি আমেদের বেগম নছি, লোকে—নবাবের বেগমেরাই আমাকে ব্যভিচারিণী দাসী বলিয়া উপহাস করে! তোমাদের নবাব আমাকে প্রণয়িণী সম্বোধন করিয়াই চরিতার্থ করিয়াছেন,—বিবেচনা করেন। আজতো আমি ভ্রমশূন্য হইতাম,—আমার নাম কেবল কাহার ও কাহারও অন্তরে জাগরুক থাকিত, নবাবের কি সদয় ব্যবহার, কি মধুর প্রেম! কৈ আমাকে উদ্ধারের কি কিছু মাত্র উপায় করিয়াছিলেন? তোমরা বাহাদিগকে দখল বল তাহাদের রূপা না হইল আর কি তোমার সাক্ষাতে আজ মনের কথা খুলিয়া বলিতে পারিতাম? অনেক দিন মনে করিতেছি,—তোমাকে সকল কথা—শেষ কথা—বলিব! সময়ভাব, উভয়ের নিষ্কর্মে দর্শনভাব! আজ বুঝিলাম,—তুমিও আমার আশা ত্যাগ করিয়াছ! আমার জীবন অতি অল্পকাল এ দেহে বাস করিবে, আর অধিক দিন এ জীবন ধারণ করিতে পারি না। তোমার নিকট শেষ প্রার্থনা,—শুনিবে?"—এলাহিফান আবদুলের হস্তে হস্তার্পণ করিলেন, আবদুলের শরীর কটকিত হইল, আবদুলের আর প্রতিশ্রুত করিতে হইবে কেন? তাহার মন নিরন্তরই এলাহি-জানের প্রতি অপিত!—কেবল ভয়ে লজ্জায় ছুরাকাজ্জাবোধে মনের ভাব মনেই রাখিয়াছিলেন!—"কি বল,—তোমার কি প্রার্থনা? আমার জীবন আমি তোমার প্রার্থনায় অনায়াসে

অক্লেশে দিতে পারি!—আবছুলের অধৈর্য্য ভাবের এই কথা শুনিয়া এলাহিজান বলিলেন,—“আবছুল,—তুমি বিবাহ কর নাই কেন,—আমার ইচ্ছা;—তুমি শীঘ্র বিবাহ কর, আমি দেখিব,—আমোদ করিব,—জীবনের শেষ আশা ত্যাগ করিব!”—আবছুল উত্তর করিবার চেষ্টা করিলেন,—তাহার রসনা কথা কহিতে পারিল না! গলগদগদে অক্ষুট প্রেম-মধুরস্বরে ক্ষণধিলসে বলিলেন,—“এ অনুরোধটি রক্ষা করিতে পারিলাম না,—আমার অন্তর আর প্রণয় উপভোগ করিতে কাতর! একবারকার ক্ষেমেই সে চিরকাল ভাষাক্রান্ত!—আমি কি বল,—আমি শুনিব!”—“আর এক অনুরোধ,—আমার জীবন যদি তোমার যজ্ঞের দাসপ্রী হয়,—তবে যে আমার জ্ঞান রক্ষা করিয়াছেন,—তাহার জীবন রক্ষার চেষ্টা করিবে!”—এলাহিজানের এই কথায় আবছুল বলিলেন,—“আমার চেষ্টায় কি হইবে? পূর্বেই বলিয়াছি,—তোমার অনুরোধে প্রাণ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি! তোমার কথায় আমি আনন্দে চেষ্টা করিব! বন্দীর জীবনের আনন্দের বহু করিব,—কিন্তু কত দূর সিদ্ধ হইবে তুমিই জান,—তোমার অনুরোধ নবাব যদি রক্ষা না করেন, তবে যে আমার কথা শুনিবেন, এ আশা রাখা! ভগ্নি,—ছুইটিই তোমার অসঙ্গত প্রার্থন,—আমার বিবাহে তোমার লাভ!—আমার অন্তর আমি যতদূর জানি; অন্যে ততদূর জানা সম্ভব নহে; আমি বলিতে পারি,—আমার বিবাহের কথায় অন্তর কেবল রোদন করে,—বিবাহঃ—সম্বন্ধ,—জ্ঞাতি বিবাদ,—প্রতিজ্ঞা—স্মরণ হইলে আমার অন্তর আকুলিত হয়! দস্যুর প্রাণরক্ষার চেষ্টা;—প্রত্যাশকার,—ক্লান্ততা—এই বটে;—কিন্তু তাহা অভাবনীয়—অচিন্তনীয়! আজকার ঘটনা স্মরণ করিলে কনকনের কে দস্যুর জীবন

রক্ষার যত্ন করিবে?”—আবদুলের কথায় পরি-সমাপ্তিতে এলাহিজান কহিলেন—“আমি জানি,—তোমার যত্ন উভয় কাৰ্য্যই সুসম্পন্ন করিতে পারে,—বাহা হইবার হইয়াছে, তুমি স্পষ্টই বলিয়াছ—আমার আশা ত্যাগ করিয়াছ,—তবে আর বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক কেন?—” “অনিচ্ছুক,—আমার ইচ্ছা বিরোধী,—যে প্রণয়ের সূত্রপাত করিয়াছিলাম তাহার কট—চিরকাল ভোগ করিতেছি, আমার এখন এই প্রার্থনা,—নবাবের অন্তঃপুরের এক মাত্র অধিষ্ঠাত্রী হও,—কিন্তু আমার প্রতি স্নেহ রাখিও,—মধ্যে মধ্যে আমায় দেখা দিও,—“তবে তোমার অন্তর কি আমায় বিস্মৃত হয় নাই? আমাদের প্রণয় কি?”—আবদুল এলাহিজানের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—“প্রাণ শেষ পর্য্যন্ত তোমাকে বিস্মৃত হইতে পারিব না, আমার দেহে জীবন থাকিতে শিরায় শিরায় প্রাণ্য সমান প্রবাহিত হইবে!”—“তবে তুমি কি এক্ষণে আমাকে পাইলে বিবাহ কর? মনে কর,—আমেদ আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, আমেদ অকালে কালকবলিত হইলেন,—আমি তোমার প্রণয়াকান্ধা করিলাম,—তুমি কি আমাকে বিবাহ করিবে?”—এলাহিজান এই প্রশ্ন করিয়া আবদুলের মুখে উত্তর প্রতীক্ষায় নতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন!—আজ আবদুল এলাহিজানের ভাবের কথায় আশ্চর্যান্বিত! যে পর্য্যন্ত এলাহিজানের সহিত আবদুলের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, সেই পর্য্যন্তই আবদুলের অন্তঃকরণ এক নিমেষ কালও মুখ ভোগে বঞ্চিত! যতদিন এলাহিজানের সংবাদ না পাইয়াছিলেন,—ততদিন বরং অনেক বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন,—কিন্তু পুনরায় নবাবের অন্তঃপুরে এলাহিজানকে দেখিয়া পর্য্যন্ত ছুঁকিসহ যন্ত্রণায় অস্থির! তিনি নিরন্তর এলাহিজানের সাক্ষাতের অভি-

লাষ করিতেন,—কিন্তু যখন দেখা হইত,—তখন তাঁহার অন্তর ঈর্ষার ক্রোধে ক্ষোভে আকুলিত হইত! এক নিমেষও তিনি এলাহিজানের প্রণয়ের আশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই, অথচ নবাবের প্রণয়িনী তাঁহার মনোহারিণী মনে হইলেই তৎক্ষণাৎ আশায় জলাঞ্জলি দিতে চেষ্টা করিতেন! কুহকিনী আশা,—পরিতাপি-জন প্রাণ-রক্ষা কারিণী আশা,—যে আশায় বয়ঃপ্রাপ্ত-সন্তান-নিহত বৃদ্ধকে বিবাহ দেওয়ায়,—যে আশা সমুদ্র-নিমগ্ন ব্যক্তিকে সমুদ্রগ দেওয়ায়, সেই আশাই আবছুলের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, সুতরাং আবছুল সে আশাকে পরিত্যাগ করিবেন,—এ ক্ষমতা কোথায়? আজ আবছুলের সেই আশা উদ্দীপিত হইল! তাঁহার অন্তর হাঁসিল,—অনেক দিনের পরে হাঁসিল! প্রণয় আশা আফ্রানদ তাঁহার রগনাকে আক্রমণ করিল, কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন,—বাক্য ক্ষুণ্ণ হইয়া না, তাঁহার চক্ষু অন্ধ বর্ষণ করিল,—মুখের অবয়ব নিরবচ্ছিন্ন প্রেম-প্রকাশক! মুহূর্ত্তেরে সবিচ্ছেদে বলিলেন,—আমি তোমারি,—ভগ্নি! আমি তোমার কথার উত্তর দিতে অক্ষম,—আমি তোমারি!”

চিরকালের প্রণয় স্রোতঃ আজ মিগিল,—প্রণয়ের ভরস্কা উভয়েরই হৃদয়ে আঘাতিত হইতে লাগিল! উভয়ের অন্তর হাঁসিল,—কাঁদিল,—কাঁপিল,—একত্রে অপরিণীম চিরজ-ছুংখের-স্রোতকে ফিরাইল! সুখের উৎস বিস্তারিত হইল! উভয়ে উভয়ের স্কন্ধে বাহু স্থাপন করিলেন,—আজ আবছুল নবাবের প্রণয়িনীবোধে এলাহিজানের সহিত সমস্তমে যে কথা কহিতেন,—তাহা ভুলিয়া গেলেন! নবাবের প্রণয়িনীকে আলিঙ্গন করিতেছেন,—আমাদের প্রণয়িনীর প্রতি আসক্ত হইয়াছেন,—তাহা বিস্মৃত হইবেন। উভয়েই বাক্য শূন্য,—



উভয়েই নিম্নক। উভয়েই মৃদুস্বরে অন্তরের ভাব প্রকাশক স্বরে মধ্য মধ্য বলিতে লাগিলেন,—“আমি তোমারি !!!”

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ।

মনের ভাব প্রকাশ!—এই মতার্থ প্রত্যুপকারেচ্ছা?

কং স্ত্রীন মোহয়তি?—

পাঠক,—কখন প্রণয়-সাগরে ডুবিয়াছ? প্রণয়জল-রাশি কখন তোমাকে আকুলিত্ত করিয়াছে? প্রণয়রসে কখন তোমার স্বর বদ্ধ করিয়াছে? যদি কখন তুমি সে ভাবে পড়িয়া থাক, তবে এলাহিজানের ও আব্‌তুলের তখনকার মনের ভাব অপরিষ্কৃত-প্রণয় সন্নিহিত মধুর-বাক্যে সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবে! এলাহিজান আব্‌তুলের সহিত বিচ্ছেদের পর আমেদের অন্তঃপুরে সাক্ষাৎ হইলেও আর আব্‌তুলের প্রতি অধিক স্নেহ জানান নাই,—অধিক ক্ষণ আব্‌তুলকে দেখেন নাই,—আব্‌তুলের সহিত অধিক কথা কহেন নাই, আব্‌তুলকে দেখিলেই স্নানবদনে হাসিতেন, আব্‌তুলের মুখে শ্লেষোক্তি শুনিলে বিরক্তি-ভাব প্রকাশ করিতেন। আজ এলাহিজানের মুখ ফুটিয়াছে,—আজ আর সে ভাব নাই, আব্‌তুল গৃহে প্রবেশ পর্য্যন্ত তাঁহার মুখে ঘন ঘন নতুন দৃষ্টিপাত করিয়া ছেন, যদিও প্রথমতঃ একবার আব্‌তুলের প্রণয়মুচক ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণে বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু এখন আর সে ভাব নাই!—“আব্‌তুল,—ভ্রাতঃ,—হৃদয়েশ্বর—আমি মরিব,—অনেক দিন স্থির করিয়াছি, মরিব!—কেবল তোমার সহিত একবার নিঃসঙ্গ সাক্ষাৎ করিবার জন্য এপর্য্যন্ত এ পাপজীবন

দেহে রহিয়াছে! আমি যদি নবাবের অন্তঃপুর চারিণী না হইতাম,—আমি যদি একজন সামান্য লোকের অন্তঃপুর প্রবেশ করিতাম,—তবে কখন না কখন আমার ইচ্ছা ফলবতী হইবার সুখভোগের আশা থাকিত!—ভাই,—আমি পাপী, আমার রসনা,—আমার কঠিনা চাটুসম্বাদিনী রসনা আমেদকে “প্রাণনাথ” সম্বোধন করিয়াছে,—আমি প্রতিজ্ঞায় স্বতঃই হউক,—বা অগতাই হউক জলাঞ্জলি দিয়াছি! মনে পড়ে—এক দিন লতামণ্ডপে,—আমাদের সেই ত্রিকোণ পুষ্করিণীর লতামণ্ডপে নিহুজনে বলিয়াছিলাম,—প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম,——ভাই,—যদি এলাহিজান বিবাহ করে, তবে আবদুলই তাহার বর,—যদি এলাহিজান কাহাকেও পতি-সম্বোধন করে,—আবদুলই তাহার পতি!—আমি সে প্রতিজ্ঞায় জলাঞ্জলি দিয়াছি! হৃদয়েশ্বর,—তুমি তো সে প্রতিজ্ঞা ভুল কর নাই! আমি পাপী,—আমি কেন তোমার চাকর-বদনমণ্ডল কেবল দর্শনাশায় নবাবের প্রলোভনে মোহিত হইয়াছিলাম?—আমি কেন নশ্বর জীবন ত্যাগ করি নাই?—আমি অগতী”—এলাহিজানের আক্ষেপ ব্যঞ্জক স্বরের এই সকল কথাই হঠাৎ শুনেই আবদুল বাধা দিয়া বলিলেন,—“প্রিয়ে, আমিই পাপী,—আমি কেন তোমাকে সে প্রতিজ্ঞা করাইয়া অনুতাপ-সাগরে ডাসাইতেছি,—অবলা,—কুল-পিঞ্জরের বিহঙ্গিণী পিতৃ মাতৃ মতানুকারিণী রমণীকে কেন সে প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলাম?—তোমার পিতার আমার সহিত নিতান্ত প্রণয়ে অমত জানিয়াও কেন সে তাব প্রকাশ করিয়াছিলাম? কেন তোমার পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়াও বিদেশে ছিলাম? কেন সে সময় তোমার অনুষ্ঠান করি নাই?—কেন নবাব যখন তোমাকে প্রণয়িণী শ্রেণীভুক্ত করেন,—আমি আপত্তি করি নাই! আমি

কাপুরুষ,—আমি ভীষ্ম! আমাকে লোকে বীর বলে! আমি কনকনের রক্ষক? অথচ যে আমার হৃদয়েশ্বরীর অধিকার করিল,—যে আমার চিরছুঃখে মগ্ন করিল,—যে আমার সুখের পথে কষ্টক রোপন করিয়াছে,—তাহারই দাস,—তাহারই আজ্ঞাবহ!”—আব্দুলের চক্ষুঃ অশ্রুপূর্ণ হইল,—বাপ্পবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হইল, শরীর কাঁপিতে লাগিল,—মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল! এলাহিজানও আব্দুলের সহিত কাঁদিতে লাগিলেন,—“আব্দুল,—তুমি কি আমার অসত্যী বোধে অবিশ্বাসিনী বলিয়া ঘৃণা করিবে?—আব্দুল এলাহিজানের কথায় চমকাইয়া উঠিলেন!—‘ঘৃণা’—তোমার প্রতি ঘৃণা,—আমি জীবন থাকিতে একথা শুনিলাম। এলাহিজান,—প্রণয়িনী, জীবিতেশ্বরী,—হৃদয়েশ্বরী,—তুমি আমাকে তাম্বল্য কর, ঘৃণা কর,—আমার অন্তর তোমাকে কখনই ঘৃণা করিতে পারিবে না”——“তবে আমি সহজে আত্মহত্যা করিব না,—তবে আমি সহজে আমার এ চিরদক্ষ চির কষ্টসহ প্রাণ ত্যাগ করিতে পারিব না,—আমি তোমাকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইব এই লাভ, এই আমার এজন্মের সুখ,—এই আমার ইহ জন্মের প্রত্যাশা, এই আমার জীবন ধারণের অবলম্বন!”——এলাহিজানের কথায় আব্দুল আকুলিত হইলেন,—“এলাহিজান,—ভগ্নি,—আত্মহত্যা,—এই কি মনস্থ করিয়াছিলে? আমার জীবনের পরিণাম কি? অগদীশ্বর এ পাপীর অপূৰ্ণে কি লিখিয়াছেন—” এই সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। এলাহিজান তাহাকে দেখিয়া বলিলেন,—কে,—রোসনজাহা!”—রোসনজাহা উত্তর করিল,—“বেগম-আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত,—রাত্রিও অধিক নাই!”——“যাও,—আমি যাইতেছি”——এলাহিজানের কথায় রোসনজাহা বাহিরে গেল! এলাহিজান

আবদুলকে বলিলেন,—“আর অধিক সময় নাই,—এক্ষণেই রাক্ষসের গৃহে ঘাইতে হইবে, একটী কথা,—দস্যুদলপতিকে প্রাণপণে যে রক্ষা করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ,—তাঁহা বিন্যত হইও না, সহজে জীবন রক্ষকের বিনষ্ট হইতে দিব না,—এতিজ্ঞা পূর্ণ হইবার সহায় কেবল তুমি,—আর আমার কেহ আত্মীয় নাই!”—আবদুল এই প্রতিজ্ঞায় চমৎকৃত!—“কি ভয়ানক প্রতিজ্ঞা,—কুলপিঞ্জরের বিহঙ্গিনী অবলার একি প্রতিজ্ঞা,—এ মনস্থ তাগ কর!”—এলাহিজান আবদুলের কথায় বাধা দিয়া আরক্ত বদনে সাহস জোষ বিমিশ্রিত কাম্পিত স্বরে বলিলেন,—“কি নারী জাতি কি ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়?—নারী জাতির কি কিছুমাত্র সার নাই! প্রত্যাশকার-কৃতজ্ঞতা স্বীকার কি নারী দ্বারা সম্ভবে না? আমরা কি প্রাণের মায়ায় এতো কাতুর? জীবন অন্তর্হিত হউক, তথাপি প্রত্যাশকারের চেষ্টা করিব! এ প্রাণ থাকিতে কখনই প্রাণ রক্ষাকারীর জীবন বিনষ্ট হইতে দিব না!”—আবদুল সবিস্ময় চকিতে এলাহিজানের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—“এই যথার্থ প্রত্যাশ-কারেচ্ছা!” গৃহের প্রতিধ্বনি আবদুলের কথার অনুকরণ করিয়া বলিল,—“এই যথার্থ প্রত্যাশ-কারেচ্ছা!”

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।

আমেদ-দর্শনে ।—জীবনে কি সুখ নাই?

“এতৎকাম কলং লোকে যদ্বয়ো রেক চিন্তা,

অন্তচিন্তকৃতে কামে শবয়ো রিবসঙ্গমঃ ॥”

আমেদের অন্তঃপুর আজ শ্রীমষ্ট, অধিকাংশ গৃহই অগ্নি-  
যোগে বিবর্ণ প্রাপ্ত,—তথা! একটি গৃহে আমেদরাজ-সুবর্ণ-

বিনির্মিত পালঙ্কোপরি উপবিষ্ট,—মধ্যে মধ্যে সুরাপান করিতেছেন, এলাহিজান আমেদের পদতলে, আমেদের মুখ আজ প্রকৃতি অপেক্ষা কিভিন্ন—বিরক্তি-ব্যঞ্জক,—রাগ-প্রকাশক,—ও ক্রেশ সন্তপ্ত! আমেদসাহ এলাহিজানকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—‘নারী—অবিশ্বাসিনী, নারী—পাপ-চারিণী !

প্রণয়,—দম্পতিকুল-মনোহারক,—বন্ধুজন-হৃদয় সন্তোষ-দায়ক বিশুদ্ধ প্রণয় চিরসুখ নিদান! এলাহিজানের সহিত আমেদের সে প্রণয় নয়, যে প্রণয় দম্পতি বিচ্ছেদে পরস্পরের হৃদয় আকুলিত করে,—প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করায় যে প্রণয়ে উভয়ের শিরায় শিরায় আনন্দ-রস প্রবাহিত করে,—যে প্রণয়ে উভয়ের চক্ষু পরস্পরকে একমাত্র দর্শনীয় বোধ করায় যে প্রণয়ে সুখ দুঃখ মুক্তি-ধারণ করিয়া অবস্থিতি করে, যে প্রণয় উভয়ের হৃদয় সমান অবিকার না করিলে টলে না, উভয়ের হৃদয় বিনিময়, স্নেহ-বিনিময়,—যে প্রণয়ের অঙ্গ, যে প্রণয় সরুদয় সম্পত্তির ঘটিয়া থাকে,—সরল হৃদয়ের ঘটিয়া থাকে,—সরলতা সে প্রণয়ের অঙ্গ,—আমেদ কখনই সে প্রণয় করিতে জানে না,—আমেদের অন্তর সে প্রণয়ের আধার নয়,—আমেদ চতুর,—কুটিল ও অহঙ্কারী!—এলাহিজানের হৃদয়ও আমেদের সম্বন্ধে সে প্রণয় করিতে চাহে না,—সুতরাং এলাহিজানও আমেদের প্রকৃতির অনেক অনুসারিণী, উভয়েই বাহ্যিক প্রণয় দেখাইতে বাধ্য!—অন্তরে ভালবাসা উভয়েরই নাই! উভয়েই সন্দ্বিগ্নচেতাঃ,—উভয়েই বিভিন্ন! মৃত্যু নিকটস্থ বৃদ্ধের সহিত যুবতীর প্রণয় যে রূপ সন্দেহময়, ইহাদের প্রণয়ও তদ্রূপ! আমেদ তিনবার এলাহিজানকে আনিতে আবছুলের বাটীতে লোক পাঠান,—কিন্তু এলাহিজান আবছুলের সহিত

কথা কাঁহিতে থাকায় বিলম্ব হইয়াছে, এলাহিজান তিনবার লোক যাইলে আসিয়াছেন, আমেদ একে রণক্ষেত্রের ঘটনায় বিরক্ত,—রাগত, তাহাতে সুরাপানে প্রমত্ত, তাঁহার হৃদয় সন্দেহে রাগে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহার উপর সুরাপান করিতেছেন, সুরা তাহার ক্রোধকে উদ্দীপিত করিতেছে, তিনি সন্দেহ বিরক্তি-স্বরে এলাহিজানকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—“নারী অবিশ্বাসিনী,—নারী পাপচারিণী!” এলাহিজান তাম্বুলা হাত স্বরে বলিলেন,—“জনাব,—নারী কুল-পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী, নারী স্বামী মাত্র অবলম্বনা! আজতো নারী অগ্নি-দক্ষা হইত, কেবল যদি সেই বীর পুরুষ আমাকে উদ্ধার—” আমেদ এলাহিজানের কথায় দ্বিগুণতর ক্রোধে বাধা দিয়া বলিলেন,—“অগ্নিদক্ষা,—বীর,—দম্ভ-বীর! ছরাত্তা বিধর্মী কাকের দম্ভা বীর! পাপিয়নী,—তুই যদি অগ্নিতে ভস্ম হইত তবে কেবল আনার ক্ষণকাল একটি সুন্দরী কুচরিত্রা নারীর বিচ্ছেদ সহ করিতে হইত মাত্র! এলাহিজান আমেদের মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন, তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইল, চক্ষু প্রকৃতি অপেক্ষাও চঞ্চল হইল,—“আমি অবিশ্বাসিনী!—যে বাহার আশ্রয় লইয়াছে, তাহার এই সততা, প্রণয়ের এই নিদর্শন, জনাব,—আপনি পৃথিবীর অধীশ্বর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাহাতে আমি সম্পূর্ণই আপনার অধীনা! সুতরাং ~~স্বতরাং~~ বলিতে কুণ্ঠিত, সামান্য গৃহস্থেরও রমণী বিপন্ন হইলে, সে আপনার প্রাণ দিয়াও তাহার উদ্ধার নাথানে যত্ববান হয়! কিন্তু আপনি কি আমার উদ্ধারের জন্য কিছুনা জ যত্ন করিয়া- ছিলেন? কেন,—করেন নাই! যে প্রণয় দম্পতি বন্ধনের দৃঢ় রজ্জু সে প্রণয় আপনি করিতে জানেন না! আমেদরাজ এলাহিজানের কথায় বাধা দিয়া সেই ভাবে বলিলেন,—

“লাপিসগি—কলঙ্কিনি—যথেষ্ট উপদেশ পাইলাম, থাক,—  
 তোর অধিক কথা কই নাই, আমি বুঝিয়াছি।” এলাহিজান  
 চতুরটি—বুদ্ধিমতী, স্বভাবতঃই প্রত্যাপন্নমতি তাঁহার সহ-  
 চারিণী! নবাবের ভাব ভক্তি দর্শনে দেখিলেন,—তাঁহার  
 ক্রোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিলে অতীর্ষ সিদ্ধির কোন সম্ভাবনা  
 নাই। সুতরাং তাঁহার প্রকৃতি-দুলভ চতুরতা করিলেন।—  
 এলাহিজানের ক্রোধ-সহচর মুখ-ভঙ্গি অন্তর্হিত হইল, চক্ষুর  
 রাগ আরক্ত ভাব অনুরাগে পরিণত হইল। সেই চক্ষুঃ নবাবের  
 হৃদয়কে লক্ষ্য করিল। এলাহিজান দুঃখিতস্বরে,—দুঃখ অথচ  
 অনুরাগ প্রকাশক স্বরে বলিলেন,—“জনাব,—দাসীর অপরাধ  
 মাজ্জানীয়,—আপনার এগরমুচক স্নেহেই দাসী আশ্পদা  
 পাইয়াছে,—আমার হৃদয় অত্যন্ত দুঃখেই আপনার মান সমু-  
 মের অনুপযুক্ত কথা কহাইয়াছে! এলাহিজান কাদিলেন,—  
 আমেদের মুখে কটাক্ষ শর নিক্ষেপ করিয়া অশ্রু জল-মোচন  
 করিলেন,—“জীবনে আপনিই আমার সহচর!” নবাবের  
 সেই ভীষণ মূর্তি কিছু নষ্ট হইল, এলাহিজানের অন্ত্র নবাবের  
 অন্তঃকরণ স্পর্শ করিল। আমেদ চিরকালই কামের বশীভূত,  
 সুতরাং তাঁহার সদৃশ লোকের হৃদয়ে কুসুমশর শীঘ্রই আঘাত  
 করে। এলাহিজানের অশ্রুজল সম্পূর্ণ রাত্রি জাগরণ সূচক  
 কষায়িত লোচনে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল।—“এলাহি,—তুমি বুদ্ধি  
 হীন, দেও সুরা!—এলাহিজান অনুজ্ঞা মাত্র সুরা দিলেন, এক  
 দুই তিন পাত্র উপযূর্ণি পাত্র সুরা প্রদত্ত হইল, আমেদ কহিলেন,  
 “এলাহি,—কাদিতেছ?” এলাহিজান আরো কাদিলেন, সরো-  
 দনে বলিলেন,—“জনাব,—দাসী আপনার নিকট সহস্র অপ-  
 রাধিনী হইলেও ক্ষমা পাত্রী!” পুনরায় সুরা,—নবাব সুরাপান  
 করিতে করিতে বলিলেন,—“ক্ষমা,—তোমাকে ভাল দাসি,—

নচেৎ এখনও তুমি নিকটে ।”—আমেদ অস্পষ্ট ভাবে এই কয়েকটি কথা বলিলেন,—এলাহিজান সেই ভাবেই বলিলেন,—  
“আমি এতো কি অপরাধ করিয়াছি ?”—তখন এলাহিজানের অতীর্ক সিদ্ধির উপক্রম হইয়াছে,—আমেদ আর কথা কহিতে অক্ষম,—জিহ্বা জড়তা প্রাপ্ত,—বাক্যের সম্পূর্ণ জড়তা ।—  
“প্রিয়ে—তুমি—রাক্ষসী,—পাপিয়সী, চক্ষু তোকে ভাল বাসে, অন্তর কি ভাল বাসে ?—তুই পিশাচি !”—সেই জড়তাময় স্বরে এই কয়েকটি অসহস্ক কথা উচ্চারিত হইল, ক্রমশঃ চৈতন্য সমূলে নষ্ট হইল, তথ্য কার্তের ন্যায় নিশ্চেষ্ট অবস্থাতেই শয়ন করিয়া রহিলেন ।

এলাহিজান নবাবকে মৃণাবাঞ্জক দৃষ্টিতে দেখিলেন,—  
কি ভাবিলেন,—মুহূষরে সবিচ্ছেদে ধসিলেন,—“পাপিয়সী,—  
অন্তর কি তোকে ভাল বাসে ?”—তাহা জানি, ছুরাআ তোকে চিনি,—আমার অন্তর কি তোকে ভাল বাসে ? তবে অগত্যা ভাল বাসা দেখাই মাত্র ! আজ সব ফুরাইল,—যে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছে, সেই দেব সদৃশ বার পুনঃ পুনঃ নিধন প্রাপ্ত হইবে,—এ দেহে শোণিত প্রবাহিত থাকিতে হইবে না, প্রাণপণে উদ্ধারের চেষ্টা করিব,—আমার জীবনে চিয়কালই কষ্টভোগ করিলাম,—দেখিব—জীবনে কি সুখ নাই !”

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।

শয়নে ।———আরো ?

“কোপস্তুয়া হৃদিকৃতো ময়ি———

সোহস্ত প্রিয়ং তব———কিমত্র বিদেয় মিনাৎ ?”

সূর্যদেব আপনার কার্যে অগ্রগর হইলেন, নৈতিক



কার্যের বাধ্যতায় তাহার মুখ ক্রোধ-মুচক আরক্ত হইল, ভয়ানক মূর্তির পূর্ণভাব,—কিরণ চতুর্দিকে ছুরিত,—জগৎ উদ্ভাষিত। নিশাচরেরা অক্লণের ছায়া দেখিয়াই পলায়ন তৎপর!—জীবগণ প্রাত্যহিক কার্যের অনুষ্ঠানে ব্যগ্র! উদর, স্বার্থ সাধনোদ্দেশি উদর পোষণের জন্য সমস্ত জীবই ব্যগ্র!—পশুকুল আহারাশ্রয়ে তৎপর হইল,—পক্ষিগণ নিদ্রাভঙ্গ-মুচক ধ্বনিতে দেশ পূর্ণ করিয়া চারিদিকে চলিল। মনুষ্য-জীবন তদপেক্ষা কষ্টে পতিত! কেহ হয়তো কোন কার্য সাধনোদ্দেশে বিদেশে যাইবে, সমস্ত রাত্রি হয়তো নিদ্রা হয় নাই,—চক্ষু নিদ্রায় আচ্ছন্ন,—শরীর অবশ,—কি করে অগত্যা শয্যা ত্যাগ করিল! আশ্তিকেরা ঈশ্বরের স্মরণ করিতে লাগিল। অলস নিদ্রা ভঞ্জে ও সহজে শয্যার মায়া ত্যাগ করিতে পারে না,—এ পাশ ও পাশ করিয়া সময় কাটাইতে লাগিল, কিন্তু সূর্য্যদেবকে স্বকার্যে অগ্রসর দেখিয়াই সকলেই স্বকার্যে ব্যস্ত! অলস উঠিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী। তাহা পি বারংবার ইতস্ততের পর ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক উঠিতে হইল।

আমেদ এখনো শয্যায়, সুরার মোহিনী মায়ায় মোহিত, অজ্ঞান,-নিদ্রিত!—সুষুপ্ত নয়,—অথচ অজ্ঞান। গৃহ শূন্য,—আর কেহ নাই,—এলাহিজনও নিকটে নাই। রোমনজ্বাহা গৃহ প্রবেশ করিল,—তাহার চক্ষু আরক্ত, নিদ্রা তখনও তাহার চক্ষুঃ হইতে অপমৃত হয় নাই,—পরাধীনা,-দাসী,-ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক আসিতে হইয়াছে! পালঙ্কের নিকটে গেল,-আমেদকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিল,—দেখিল সম্পূর্ণ অজ্ঞান! সে পালঙ্কের নিকটস্থ একখানি সুচারু আসনে উপবেশন করিল। আসনে বসিতেই হিদ্রাশ্লেষণী নিদ্রাদেবী

বল প্রকাশ করিলেন, চক্ষু ক্রমশঃ মুদ্রিত হইল,—কি ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রায়—বিরাম দায়িনী নিদ্রার অঙ্কে আশ্রয় লইল। গৃহ নিস্তব্ধ,—এক ঘণ্টা—দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হইল,—গৃহ সেই ভাবেই নিস্তব্ধ !

এক জন প্রোঢ়া পরিচারিকা গৃহে আসিল,—দেখিল,—আমেদ শয্যায় শয়ান নিদ্রিত,—সিংহাসনে হেলান দিয়া, রোসনজাহা অর্ধেক শয়ান অর্ধেক উপবেশনে নিদ্রিত!—পরিচারিকা বিরক্তি-সূচক দৃষ্টিতে এদিক্ ওদিক্ চাহিল,—অক্ষুট বিরক্ত ও হেস-পূর্ণ স্বরে বলিতে লাগিল,—‘বেগম,—নূতন বেগম কৈ!—আবার কি রোসনজাহা বেগম হইল না কি? হইতেও পারে,—কাম-প্রবৃত্তি কিছুতেই নিবৃত্তি হইবার নহে,—উঃ,—কি স্পর্ধা,—সিংহাসনে,—নবাবের সিংহাসনে—শয়ন! আমিও যে,—এও সে, তবে অহঙ্কারিণীর এতো স্পর্ধা কেন?—এলাহিজান,—ব্যভিচারিণী এলাহিজানের প্রিয়া,—এই কি স্পর্ধার কারণ?—না,—নবাব কি এলাহিজানকে প্রকৃত বেগমের ন্যায় আন্তরিক স্নেহ করেন? কখনই নয়,—তাহা হইলে এলাহিজানের অদর্শনে তাহার অন্তর সমধিক কাতর হইত,—তাহা হইলে দম্ভ আক্রমণ সময়ে একাকিনী রাখিয়া পলাইতেন না!—পাপাশক্ত নবাব কেবল তাহার কামপ্রবৃত্তি নিবৃত্তি করিবার আশায়—এলাহিজানকে মৌখিক স্নেহ দেখান। কি কপাল,—এক দিন ঐ এলাহিজান আমার সহিত সখীভাবে কথা কহিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে,—এক দিন আমার দ্বারা উপকারের প্রত্যাশা করিয়াছে! আর এখন,—গৌরবে আমার সহিত কথা কহিতেও ঘৃণা বোধ করে! নারীর যৌবনই সুখ ছুঁখের কারণ, নারীর যৌবনই শুভাদৃষ্টির প্রযোজক! আমাদের যৌবন নাই,—শুভাদৃষ্টিও নাই! রোসন-

আহার এখনও যৌবন আছে,—তাই বা শুভদৃষ্ট ঘটয়াছে ?”—  
 পরিচারিকা এই সকল কথা এমতি দুঃখিতা ভাবে—ছেব ভাবে—  
 কহিতেছিল,—যে তাহার বাহু জ্ঞান শূন্য ! সে দেখিতেছে না,  
 তাহার পশ্চাতে কে দাঁড়াইয়া সকল কথা শুনিতেছে ! তাহার  
 কথার প্রারম্ভেই এলাহিজান গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন, কিন্তু  
 হিংসার আক্রমণে পরিচারিকা অজ্ঞান,—হিংসার মহীয়সী শক্তি  
 যখন যুগের প্রতি আক্রমণ করে, তখনই সে হিতাহিত বিবে-  
 চনা শূন্য হয়। এলাহিজান গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—  
 নবাব সেই ভাবে শয়ান,—পালঙ্কের নিকটস্থ সিংহাসনে  
 রোসনজাহা নিদ্রিত, সেই সিংহাসন অবলম্বনে পরিচারিকা  
 দাঁড়াইয়া ঐ সকল কথা কহিতেছে, এলাহিজান সকল  
 শুনিতে লাগিলেন,—পরিচারিকার কথা গুলি তাঁহার মস্তি-  
 শ্চান ভেদ করিল। আর থাকিতে পারিলেন না,—বিরক্ত স্বরে  
 বলিলেন,—“তোয় ইচ্ছা হইয়া থাকে নবাবের বেগম  
 হা!”—পরিচারিকা চমৎকৃত ভীতা,—এলাহিজানের মুখে  
 দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল,—দেখিল তাঁহার চক্ষুঃ আরক্ত, মুখ  
 প্রকৃতি অপেক্ষাও আরক্ত!—আর কথা নাই,—শরীর  
 কম্পিত হইল। এলাহিজান আর পরিচারিকাকে কিছু  
 বলিলেন না,—কেবল—“এখান হইতে অস্ত্র স্থানে যা—”  
 বলিতেই পরিচারিকা কুণ্ঠিত ভাবে চলিয়া গেল। বেলাও  
 অনেক হইয়াছে, এলাহিজান পালঙ্কে উঠিলেন, নবাবের  
 অবয়ব নিরীক্ষণ করিলেন, দেখিলেন,—ক্রমশঃ নবাবের  
 চৈতন্যের পূর্বলক্ষণ উপস্থিত হইতেছে, তিনি মুছ মুছ বাজনে  
 নবাবের কপাল নিঃসৃত শ্বেদবিন্দু অপহরণ করিতে লাগি-  
 লেন। মুছমুছে শব্দঃ বলিতে লাগিলেন,—“পত্র খানি যদি  
 অন্যের হস্তগত হয়? বন্দী পাইয়াছে তো?”—এই সময়ে

রোসনজাহা ভীতার নায় চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল,—  
পালঙ্কে নবাবের মস্তকের নিকট এলাহিজান উপবিষ্টা;  
রোসনজাহার দৃষ্টি সর্পিাক্রমে সেই দিকে রহিল! এলাহিজানেরও  
দৃষ্টি রোসনজাহার উপর পড়িল! এলাহিজান রোসনজাহার  
ভাব ভক্তি দর্শনে স্পর্ষিত বুঝিয়াছেন,—রোসনজাহা কি ভয়ানক  
স্বপ্ন দেখিয়াছে, এলাহিজান স্মিতমুখে বলিলেন,—রোসন,—  
পাগল হইলি না কি? এক দৃষ্টে কি দেখিতেছিছ! এতক্ষণ  
পরে রোসনজাহার চমক ভাঙ্গিল! সে নবাবের সিংহাসনে শয়ন  
অকর্তব্য বিবেচনা করিল! এতক্ষণ যে স্বপ্ন দেখিতে ছিল,  
তাহা স্মরণে দেহ কণ্টকিত! বিস্ফারিত-নেত্রে উঠিয়াই  
নবাবকে দেখিতে লাগিল, এমন সময়ে আমেদের নিদ্রা  
ভাঙিল,—ভয়ানক শব্দে বলিয়া উঠিলেন,—“এলাহিজান,—  
পিশাচি!” আরক্ত নেত্রে এলাহিজানের মুখে দৃষ্টি-নিষ্ক্ষেপ  
করিলেন, “এতক্ষণ কোথায় ছিলাম?—ব্যভিচারিনি,—আব্দুল  
ও দয়্য তোমার নায়ক হইয়াছে?” এলাহিজান আশ্চর্যান্বিতা  
বিরক্ত তাক্ষর্য্যভাবে বলিলেন,—“হইতে পারে!” নবাব উঠিয়া  
বসিলেন, মুখশ্রী ভয়ানক,—রক্তবর্ণ!—“আমি পূর্বে শুনিয়া-  
ছিলাম—পিশাচী,—তুই আব্দুলের প্রণয়কাঙ্ক্ষণী, এই জন্যই  
তুই এইখানে থাকিতে ভাল বাসিস্? এই জন্যই তুই আব্দুলের  
সহিত আলাপ করিতে ভাল বাসিস্, এই জন্যই আব্দুলের  
বাটী গিয়াছিল? সেই জন্যই কাল লোক পাঠাইলে আমিতে  
বিলম্ব করিয়াছিল?” এলাহিজান বুঝিলেন,—নবাবের তাঁহার  
উপর দারুণ সন্দেহ উপস্থিত, ভাবিলেন,—“হয়তো তাঁহার  
নামে কেহ কলঙ্ক রটনা করিয়াছে, তিনি দুঃখিত স্বরে বলি-  
লেন,—“এই কি আমার দুঃখিত্বতার প্রমাণ?”—“যথেষ্ট  
প্রমাণ পাইলাম,—কেবল প্রমাণেই হইবে না, ইহার উপযুক্ত

শাস্তিও হইবেক আগে তোর নায়কদের শাস্তি হউক!—  
এলাহিজান অশ্রুশূর্ণ-লোচনে বলিলেন,—“শাস্তি—যথেষ্ট  
হইয়াছে,—আরো?”

উনবিংশ পরিচ্ছেদ ।

স্নেহে।—অভিসারিকা,—এলাহি-বাচিচারিনী ।

“প্রায়শ্চৈব হি দৃশ্যন্তে কামংস্বপ্নাঃ শুভাশুভাঃ ।”

আমাদের অন্তর একেবারে এতো দৃঢ় বিশ্বাস কিসে  
করিল? কি জন্যই বা আমেদ আবতুলকে লক্ষ্য করিলেন?  
কেহ কি আমাদের নিকট আবতুলের ও এলাহিজানের  
কথোপকথন বলিয়াছে,—না,—কেহ বলে নাই! কে বলিবে?  
সে সময়তো কেহই ছিল না, রোসনজাহ! কি তবে অনুমান  
করিয়া উভয়ের ভাব ভক্তি দেখিয়া বলিয়াছে?—না,—কথ-  
নই সম্ভব নহে, এলাহিজান যে রোসনজাহার চিরানুগতা,—  
হিতাকাঙ্ক্ষিনী! তবে ও ভাব কেন? সন্দেহ!—সন্দেহই  
মনুষ্যের বিষময় ফল উৎপাদনের নিদান, যাহার অন্তর কখন  
সন্দেহ আক্রান্ত হইয়াছে, সে বুঝিবে,—সন্দেহ মনুষ্যের ক্ষত  
অনিষ্ট করে,—সন্দেহ মনের পবিজ্ঞ-ভাব নাশক,—অনিষ্টচয়  
সমুৎপাদক,—ভয়াল মূর্তি সান্নানাদিক বাক্য সমাদিনী প্রাচীন  
তিম্ভিড়ী বৃক্ষ সমাশ্রয়া পেতিনী মূর্তি সেই সন্দেহেরই প্রযে-  
জক! কেবল দৃষ্টি নয়,—চিরসংস্কার; অন্ধকার রাত্রে এক  
গৃহ হইতে অন্য গৃহে গমনাগমনে অশক্ত! প্রাণপ্রতিমা পতি-  
মাত্র অবলম্বনা—সতী রমণী সেই সন্দেহ-কুহকে চিরঅবি-  
শ্বাসিনী রাক্ষসী রূপে পরিণত হয়! একমাত্র স্নেহপাত্র ভ্রাতৃ-  
বৎসল সোদরের স্নেহপাশ শিথিল হয়! আজ তুমি সন্দেহকে

হৃদয়ে স্থান দেও,—তাহার ক্ষণপরেই জাজ্জল্যমান কারণ সমস্ত সেই সন্দেহ হইতেই সমুৎপন্ন হইবে! সৰ্ব্ব সম্ভাৱ হারিণী নিজ্জার অন্ধে আশ্রয় গ্রহণ কর, সেই সন্দেহকে স্বপ্ন আরো উদ্দীপিত করিবে, যত সন্দেহকে হৃদয়ে দীর্ঘকাল স্থান দিবে ততই তোমার হৃদয় অস্থির হইবে! চিরকালই আমেদ এলাহিজানের প্রতি সন্দিগ্ধ! গত রাত্রি জাগরণে ক্রেশে আমেদ আজ অনুশ্র—সে অনুশ্রের আরও কারণ সন্দেহ, আজ আর কোন কার্যই করিতে পারেন নাই; মামুদ একবার সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন,—তঁাহাকে বলিয়াছেন,—“দস্যুপতির বিচার আগামী কল্য হইবে, যদি পার দস্যুপতিকে মোক্ত দেখাইয়া সুবর্ণ-দুর্গের কোন স্থানে তাহাদের গুপ্ত ভাণ্ডার জানিয়া লও,”—মামুদেরও তাহা অভিপ্রায়, বিচক্ষণ মামুদ সেই মন্তের উপরই নির্ভর করিয়া আহলাদ প্রকাশ করিয়া ছিলেন! কনকনের সর্বত্রই প্রচার,—“অন্ত আমেদসাহার শরীর অনুশ্র, আগামী কল্যই বিচার হইবে,—দস্যুপতির জীবন এখনো একদিন আছে!”—আমেদের নিরবস্থির চিন্তা আবতুল ছুরাকাজ্জ কি না? আবতুল এলাহিজানের প্রতি আশঙ্কে কি না? কিন্তু আবতুলের ভাব-ভক্তির সন্দর্শনে তাহার এলাহিজানের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ-স্মরণে সে প্রান্তের উত্তর হৃদয় সম্পূর্ণ মত দিতেছে! সমস্ত দিনই সকল চিন্তাপেক্ষা সেই চিন্তা প্রবলা,—চিন্তার শেষ নাই! এলাহিজানকে আর তাহার নয়ন অধিকক্ষণ দেখিতে চাহে না,—তঁাহাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইয়াছিলেন,—সে উত্তরগুলিও সন্দেহ উদ্দীপ্তকর, একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—“এলাহি, আবতুল তোমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে?” এলাহিজান তত্বতরে বলিলেন,—“আবতুল তো আমার পর নহে,

তিনি আমার পরমাশ্রয়, চিরকালই আমাকে যথেষ্ট ভাল বাসেন, তাহাতে এখনতো আপনারোগম,—তিনি যতদূর সম্ভাব্য করিতে হয়,—করিয়াছেন! আবছুলের ন্যায় সং-প্রকৃতির লোক কনকনে আর নাই!”—আমেদ নিতান্ত সন্মোহ জনিত বিরক্ত স্বরে বলিলেন,—“আবছুলের সহিত তোমার চিরকাল প্রণয়—না?” এলাহিজান কিছু অপ্রতিভ ভাবে অক্ষুণ্ণ স্বরে বলিলেন,—“আবছুলের সহিত প্রণয়,—চিরকাল একত্রে সহবাস,—তিনি আমাকে ভাল বাসেন,—আমিও ভাল বাসি!”—বলিতে বলিতে তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী কাঁপিল, মুখ মলিন হইল, রসনা বিরস হইয়া আসিল, জড়প্রাণ স্বরে বলিলেন,—“ভ্রাতৃত্বমী স্নেহ জনাব,—কখনই যাইবার নহে!” নবাব বিরক্ত স্বরে বলিলেন,—“যথেষ্ট স্নেহ,—বুঝিয়াছি!” এলাহিজান আর কথা কহিলেন না, তাহার সেই যুবক মনো-মোহন চক্ষু অশ্রুবর্ষণ করিল! নবাব বিরক্তভাবে খুঁরাপাত হস্তে লইয়া অণ্ণে অণ্ণে পান করিতে লাগিলেন। আবার এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—“দস্যুরা তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে?” এলাহিজানের সে কথা ভাল লাগিল না, দস্যু শব্দ তাঁহার বর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ে আঘাত করিল, তিনি অসন্তুষ্ট ভাবে সে কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন,—“যিনি আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, তিনি দস্যু নামের উপযুক্ত নহে, তাদৃশ বীর, উদার প্রকৃতি, কোমল হৃদয় আমি কখন দেখি নাই, শুনিয়াছি,—তিনি এখন কারাগারে, আপনি দেখিয়াছেন কি না,—জানি না, তাঁহার অব-য়ব দেব সদৃশ,—তিনি আমাকে যেরূপ অসম সাহসে উদ্ধার করিয়াছেন,—নবাবের দস্যুপতির প্রশংসা ভাল লাগিল না। তিনি এলাহিজানের কথায় বাধা দিয়া উদ্ধতভাবে বলিলেন

“আমি তাহার বর্ণনা শুনিতে চাহি না, কিরূপে তোমাকে উদ্ধার করিল,—তাহাই বল!” এলাহিজান বলিলেন,—  
 “আমরা গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত অগ্নি দেখিয়া রোদন করিতেছি,—  
 জীবনে হতাশ্বাস হইয়া রোদন করিতেছি!—এমত সময়ে তিনি  
 আসিয়া উদ্ধার করিলেন! তাঁহার সে সময়ের কথাগুলি এখনও  
 মনে রহিয়াছে!—জনাব,—দাসী তজ্জন্যই প্রাণ রক্ষা-  
 কারীর জীবন ভিক্ষা চায়!” আমেদ সেই বিরক্ত স্বরেই বলি-  
 লেন,—“তাঁহার জীবন যাহাতে শীঘ্র না গিয়া ক্রমশঃ যায়,  
 তাহাই চেষ্টা করা হইবে!—সেও কি তোমার মনোহরণ করি-  
 য়াছে?” এবার এলাহিজান তাড়ুলা বিরক্তি স্বরে বলিলেন,—  
 “হইতেও পারে!” আমেদের মুখ হিঙুগতর জোখে চিহ্নিত  
 হইল,—চক্ষু আরক্ত! আর কোন কথা কহিলেন না,—কেবল  
 মধ্যে মধ্যে এলাহিজানকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন, এবং  
 সুরাপান করিতে মনোযোগী হইলেন।

সন্ধ্যাসতী যামিনীর প্রবলতা দেখিয়া অন্তর্হিতা, আপনার  
 হৃদয় আপনি শাস্ত করিতে চেষ্টিতা,—নিশাচরেরা সন্ধ্যাকে  
 ব্যঙ্গ করিয়া হাঁসিল, কলকণ্ঠ নিনাদী পক্ষিকুল সন্ধ্যার চুর্দ্দশা  
 না দেখিতে পারিয়াই যেন কক্ষণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল  
 নিদ্রাদেবী আপনার প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিতে লাগি-  
 লেন, তাঁহার মোহিনী-মস্তুর শক্তি প্রথম চির অলস বালক-  
 গণের পুস্তকের অক্ষরে প্রবেশ করিল! অলস বালক যত  
 পুস্তক দেখিবার ইচ্ছা করে, ততই নিদ্রার মোহিনী মস্তুর  
 প্রভাব তাহার নয়নের পদ্মদয়কে মুদ্রিত করে! আমেদ সে  
 সময় শয্যায়, পার্শ্বে এলাহিজান বসিয়া কুণ্ঠিত ও মলিনভাবে  
 সুরা দিতেছেন!—এবং নবাবের অপরিমিত সেবা করিতেছেন,  
 আমেদ সুরার মোহিনী মায়ায় ক্রমশঃ দগ্ধ!—“এলাহিজান,



পিশাচী, ব্যভিচারিণী, পার্শ্বে বসিয়া ভাবিতেছে, উহার  
 কুহকে পুনরায় আমি ভুলিব! ব্যভিচারিণী আবহুলের ও  
 দস্যুর উভয়েরই প্রণয়াকাজক্ষণী,—নচেৎ উভয়ের নাম করি-  
 তেই অন্যমন্য কেন?" এইরূপ নানা আন্দোলন করিতেছেন,  
 যত আন্দোলন করিতেছেন, ততই তাঁহার সন্দেহ বৃদ্ধি পাই-  
 তেছে! সুরার স্বভাবই এই, যাহার যে প্রকৃতি তাহা উদ্দীপ্তা  
 করে! সুরা সেই সন্দেহকে দৃঢ় করিতেছে, নবাবের সুরার  
 মোহিনী মায়ায় মোহিত হইয়া অজ্ঞান হওয়ার পরেই তত্ত্বা  
 আসিল,—আমেদ স্বপ্নে দেখিলেন,—এলাহিজানকে যে সন্দেহ  
 করিতেছিলেন, সেই সন্দেহই প্রবল!—এলাহিজান যেন  
 বিশেষ রূপে আমেদের নিদ্রার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন,—  
 তাঁহার নিশ্চয় প্রতীতি হইল আমেদ নিদ্রিত,—তিনি শয্যা  
 হইতে উঠিলেন, আমেদও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষিত ভাবে  
 গেলেন,—এলাহিজান কারাগারে বন্দীদস্যুর নিকট উপস্থিত  
 হইয়া দস্যুকে প্রণয়ীর ন্যায় অভিবাদন করিল। বন্দী দস্যু  
 দুঃখিত স্বরে কহিল,—“প্রিয়ে,—আর আমার আশা বৃথা,—  
 ভাবিয়াছিলাম আমেদকে জয় করিয়া তোমাকে লইয়া সুখী  
 হইব, কিন্তু তাহা আমার অদৃষ্টে ঘটিল না! তোমাকে অধি  
 হইতে উদ্ধার করার পরেই আমেদ বহু সৈন্যসহ আমাকে  
 আক্রমণ করে,—পরে এখন আমি বন্দী!—তুরাত্মা যবনের  
 কারাগারে বন্দী,—আর জীবনের আশা নাই! এলাহিজান  
 তদন্তরে তাহাকে যথেষ্ট সাহস দিয়া বলিতেছে,—“ভয় নাই,—  
 আমি তোমাকে উদ্ধার করিব,—আমি উদ্ধারের পথ করি-  
 তেছি, আবহুল আমার আজ্ঞাকারী,”—আমেদের আর সন্ত  
 হইল না,—ভয়ানক স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—“এলাহি—ব্যভি-  
 চারিণী!”

বিংশতি পরিচ্ছেদ ।

রাজসভা ।——অন্তিমকাল উপস্থিত ।

ন কশ্চিচ্চণ্ড কোপানামাশ্রীয়ে। নাম ভুভুজাং,

হোতারমপি জুহুস্তং স্পৃষ্টো দহতি পাবকঃ ।

আজ দস্যুপতির বিচারের দিন, রাজসভায় কনকনের প্রধান প্রজামণ্ডলি প্রধান প্রধান মৈনিকগণ নমুপস্থিত!—কিন্তু রাজ-সিংহাসন এখনও শূন্য, আমেদ সভায় উপস্থিত নাই, সকলেই তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে! রাজ-সিংহাসনের পাশ্বে আবদুল উপবিষ্ট, তৎপাশ্বে মামুদ, আবদুলই কনকনের বিচারকর্তা, কিন্তু রাজবিদ্রোহী প্রধান বন্দী দস্যুর বিচার আমেদ স্বয়ং করিবেন,—সুতরাং আজ আবদুল সহকারী বিচারক; মামুদের সহিত আবদুল কি কথোপকথন করিতেছেন, দুই জনের স্বরই মৃদু, পরস্পরের কথা অপরের অন্ত্রাব্য। মামুদ বলিতেছেন,—“আপনার মত আমারও সম্পূর্ণ অনুমোদনীয়, মহারাজকর্তৃক যেকূপ দৃঢ় অধাবসায়-সম্পন্ন সাহসী, ইহাতে কেবল বন্দী দস্যুপতির প্রাণদণ্ডে যে তাহারা শাস্ত হইবে, ইহা কোন মতে সম্ভব নহে, কেবল কতকগুলি ভুজঙ্গ উত্তেজিত করা মাত্র!—তাহাদের বৈরনির্বাতনেচ্ছা কখনই যাইবার নহে, অথচ তাহাদের বশতা স্বীকার না করাইলে কনকনের প্রজাকুলের শান্তি সংস্থাপন হইবেনা!—” আবদুল বলিলেন,—“আমারও তো সেই বক্তব্য,—ওদিকে দিল্লীর যে কূপ অবস্থা, এ সময়ে যাহাতে মিত্র সংগ্রহ হয়, তাহারই চেষ্টা করা উচিত, কিন্তু আমেদরাজ গত কল্য যেকূপ অপরিমিত সুরা পান করিয়াছেন, তাহাতে আজ যে

তাঁহার কোন কথা হৃদয়ে স্থানলাভ করিবে,—বোধ হয় না।”—মহম্মদ আব্দুলের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—“আমার মতে আজ বিচার কার্য বন্ধ রাখাই উচিত, একপ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা আবশ্যক,—মহারাক্ষীরেরা নিতান্ত হীন শত্রু বিবেচনা করা অনুচিত,—তাঁহারা সকলে সমবেত হইলে যে কনকনের সৈন্তাপেক্ষা অল্প সংখ্যক হইবে, ইহাও বোধ হয় না,—আবার আমাদের সৈন্তাপেক্ষা তাঁহারা সাহসী, চতুর ও সুশিক্ষিত।—“এই কথার অনবসানেই আমেদসাহ সভায় আগমন করিলেন, সকলে সমস্ত্রমে উঠিয়া অভিবাদন করিলেন, নবাবের চক্ষুঃ তখন সুরার মায়ায় আচ্ছন্ন, তিনি চঞ্চল পদক্ষেপে আসনে বসিয়া সকলকে যথাস্থানে উপবেশন করিতে সঙ্কেত করিলেন, পরে আব্দুলকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বিরক্তভাবে বলিলেন,—“এখনও দস্তাবেজ উপস্থিত করা হয় নাই কেন?” আব্দুল নম্রভাবে বলিলেন,—“বান্দা হুজুরের অনুমতির অপেক্ষা করিতেছে, আরও যদি অনুমতি করেন,—আমাদিগের দস্তার বিচার সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে! আমেদ সেই স্বরে বলিলেন,—কি—বল?” আব্দুল মামুদকে লক্ষ্য করিলেন,—মামুদ বিনিত ভাবে বলিলেন,—“এ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, তাহা ঘোপনে বলাই বান্দাদিগের অভিপ্রেত; “তাহাই ভাল”—বলিয়াই আমেদ সভ্যমণ্ডলের সিংহাসন হইতে গাত্ৰোত্থান করতঃ তৎপার্ষস্ব নিভৃত-কক্ষে প্রবেশ করিলেন,—তৎসহ সে গৃহে কেবল মামুদ ও আব্দুল প্রবেশ করিলেন,—সভাস্থ সকলে কিছু না বুঝিতে পারিয়া পরস্পর অনেক ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিল।

নিভৃত কক্ষে আমেদসাহ, মামুদ ও আব্দুল পৃথক্ পৃথক্ আসনে উপবেশন করিলেন আমেদ বলিলেন,—“কি বলিবে,—

বল ?" আব্দুল মামুদকে লক্ষ্য করিলেন । মামুদ প্রথম বলিলেন,—“রাজ্যের হঠাৎ প্রাণদণ্ডা করা আমাদের অনভিপ্রেত, কারণ মহারাজ্যীয়দিগের অত্যাচার হইতে তাহা হইলে প্রজাকুল কোন মতেই রক্ষা হইবেনা !—আমেদ তাম্বুল্য হাস্য বলিলেন,—“ তবে কি দস্যুর ভয় করিতে হইবে ? দস্যুর সহিত কি সন্ধি স্থাপন করিতে হইবে ?” মামুদ বলিলেন,—“ বান্দা তাহা বলিতেছে না, মহারাজ্যীয়েরা বীর, মুসলমান কাপুরুষ, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে অশক্ত, আমি বাতুল মহি, যে, এ সন্দেহ করিব, কিন্তু তাহারা যেচতুর, অসমসাহসী এ কথা কে অস্বীকার করিবে ?—তাহাদিগের অত্যাচার হইতে প্রজাগণকে যদি সহজে রক্ষা করা যায়, তাহার চেষ্টা করা উচিত !—আমেদ মামুদের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—“ তোমাদিগের কি অভিপ্রায় স্পষ্ট বল !” মামুদ বলিলেন,—“ বান্দাদিগের মতে দস্যুপতির প্রাণদণ্ডা না করিয়া যদি সে বশ্যতা স্বীকার করে,—তাহার চেষ্টা করা উচিত ! মহারাজ্যীয়েরা দস্যু বটে, কিন্তু গত্যবাদী, সে যদি অধীনতা স্বীকার করে, আমি বলিতে পারি,—সুবর্ণ-দুর্গ অধীন হইবে ! সুবর্ণ-দুর্গের মহারাজ্যীয়েরা সকলেই দস্যুপতির বাধা !—আমেদ মামুদের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—“ কি বলিয়া রাজবিদ্রোহী দস্যুর জীবন দান করা যাইতে পাবে ?”—আব্দুল ভুতুরে বলিলেন,—“ প্রথম আর আর প্রধান দস্যুরা কেহই নিহত বা বন্দী হয় নাই, তাহাদিগকে বন্দী বা হত করিতে যথেষ্ট ব্যয় ও কষ্ট হইবে, প্রজারও নিরন্তর তাহাদিগের দোরাঙ্ক্রে পীড়িত হইবে,—এ অরহায় দস্যুপতির দ্বারা সে আশঙ্কা নিবারিত হইলে সকলেই সন্তুষ্ট হইবে । দ্বিতীয় রাজবিদ্রোহীর পাপের শাস্তি প্রাণদণ্ডা বটে, কিন্তু সে

বেগমের প্রাণ রক্ষা করিয়াছে, যদি দস্যু রাজ-বিদ্রোহী না হইত, তবে সে কত পুরস্কার পাইত, এক্ষণে বেগমের প্রাণ রক্ষার পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে প্রাণদান করা যাইতে পারে!" আমেদ আবদুলের কথায় সন্দেহ-জনিত স্বরে বলিলেন,—

“বেগম কি তোমাকে অনুরোধ করিয়াছেন?”—আবদুল কিছু অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন,—“অনুরোধ করিবেন কেন,—আজ্ঞা করিয়াছেন! আমার পক্ষে—আপনার আজ্ঞাও যেমত, বেগমের আজ্ঞাও তেমতি মাননীয়!” চিরসন্দিক্ষ নবাব আবদুলের কথায় আরো সন্দিক্ষ হইলেন,—সুরার মোহিনী মায়া এখনও তাঁহাকে সদস্য বিবেচনা করিতে দিতেছে না, তাঁহার ক্রোধ উপহিত হইল, বিরক্ত ক্রোধ বিমিশ্রিত স্বরে বলিলেন,—“বেগম দস্যুকর্তৃক তোমার বাটীতে অর্পিত হইয়া বুঝি মনের কথা বলিয়াছে? বেগমের মৃত্যুতে আমি কত কাতর হইতাম না, তোমার বাটীতে দস্যুকর্তৃক অর্পিত হওয়ায় যত কাতর! তুমি বেগমকে যথেষ্ট আদর করিয়াছ!”—আবদুলের দেহে শোণিত খরতর প্রবাহিত হইল, মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল,—বিরক্ত স্বরে বলিলেন,—“বান্দার যথেষ্ট অপরাধ!”—“তাহা আর বলিতে হইবে কেন? আমি জানি,—এলাহি ব্যভিচারিণী, সে তোমাকে দেখিতে তোমার সহিত কথা করিতে চিরকাল ভাল বাসে!”—আমেদের কথায় আবদুল দ্বিগুণতর বিরক্ত হইয়া তাক্কল্য ভাবে বলিলেন,—“হইতে পারে,—কেগম আমার পর-নহে, এক সময়ে আমিই বেগমের পরমাত্মীয় ছিলাম! দুর্ভাগ্যবতী যদি আপনার অন্তঃপুরে প্রবেশ না করিত, কখনই আপনি এক্ষণ সন্দেহ করিতে পারিতেন না!” আমেদ স্নাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অধৈর্য্য ভাবে বলিলেন,—“ছুরাআ,—তুই তবে এলাহির প্রণয়াকাক্ষী!”

আব্‌তুলের শরীর কাঁপিতেছে,—চক্ষুঃ আরক্ত, মুখ আরক্ত।  
 রাগ অভিমান যুগপৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। মামুদ  
 এতক্ষণ নিস্তব্ধ ছিলেন,—দেখিলেন, কথায় কথায় তরানক  
 আনিমেষের সূচনা হইতেছে! তিনি বিনিত ভাবে আমেদকে  
 বলিলেন,—“বান্দার মবেদন,—হজুরের শরীর দেখিতেছি  
 নিতান্ত অসুস্থ, নানারকমে বিরক্ত, এক কথায় অন্য কথা হইতে  
 লাগিল। বেলাও অনেক হইয়াছে, আমার মতে অল্প দস্যুর  
 বিচার বন্ধ থাকুক, আগামি কলা হইবে।”—আমেদ মামুদের  
 কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—“দস্যুর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা ব্যতীত  
 অন্য কোন বিচার নাই।”—মামুদ সেই নম্রভাবে বলিলেন,  
 “হজুরের মত আমরা কেহ খণ্ডন করিব, বিবেচনা করিবেন না,  
 তবে হজুরই অনুগ্রহপূর্বক আমাদিগকে মত প্রকাশের ক্ষমতা  
 দিয়াছেন, তজ্জন্য যাহা বলি।—দস্যুর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিবার  
 পূর্বে তাহার দিগের গুপ্তভাণ্ডারের যদি কোন সন্ধান পাওয়া  
 যায়, তাহার চেষ্টা আবশ্যিক। আজ আপনার শরীর নিতান্ত  
 অসুস্থ, আব্‌তুল সাহেবের শরীরও অসুস্থ! এক কথায় অন্য  
 কথায় আন্দোলন হইতেছে, আজ আর কোন বিষয়ের  
 আন্দোলন করা হজুরের ক্রেশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।”—আমেদ  
 মামুদের কথায়ও সুবর্ণভূর্গের সক্ষিঃ ধনলাভের প্রত্যাশায়  
 বলিলেন,—“আচ্ছা,—তোমার অনুরোধে অল্প দস্যুর বিচার  
 বন্ধ রহিল, আমারও শরীর নিতান্ত অসুস্থ বটে, অল্প সভাস্থ  
 সকলের নিকট এই আজ্ঞা প্রচার কর!”—এই বলিয়াই বিরক্ত  
 ভাবে আমেদ উঠিয়া গেলেন। মামুদ বাহিরে আসিয়া রাজ-  
 আজ্ঞা প্রচার করিলেন। সকলেই বলিল,—আজও দস্যুপতির  
 পরমায়ুঃ আছে, সভা ভঙ্গ হইল।

আব্‌তুল সেই নিভৃত কক্ষে বিরক্তভাবে বসিয়া আছেন

নিস্তদ্ধ, চক্ষুঃস্বর্ণবর্ণ সজল ! পুনরায় মামুদ গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি আব্দুলের মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া নম্র ভাবে কহিলেন,—  
 “নবাব সুরাপানে উদ্বল,—আমি নি বিরক্ত হইলে এসময়ে কনকন হত হ্রী হইবে মন্দেহ নাই।” আব্দুল মামুদের কথায় বলিলেন,—“কথার ভাব দেখিলেন তো ?” মামুদ তত্বতরে বলিলেন,—“আমি জানি,—সে রাত্রে আগায় স্পষ্ট বলিয়া ছিলেন,—তোমরা দস্যুর আগম জানিতে পারিয়াছিলে, তখন সে কথা লইয়া আন্দোলন করিলে আর কনকন দস্যুর কবল হইতে রক্ষা হইত না ! নবাবের ক্রোধের পাত্রাপাত্র নাই, উহার নিকট মান সত্ত্ব ম রক্ষা হওয়া ভার, এই কনকনে নবাবের সহজ ক্রোধ জনাই সকলে উহার বিপক্ষ ! চলুন,—এখন গৃহে চলুন, নবাবের বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়াছে,—বোধ হয়,—“অন্থিম কাল উপস্থিত !”

---

এক বিংশ পরিচ্ছেদ ।

পুণ্ডরীক।—আব্দুল ও মামুদ ।—বিপদেই তো বস্তুত !

---

“তন্মিত্রমাশ্রিত্য সুখে চ সমং প্রযাতি ।”

বেলা সার্কি দ্বিপ্রহর, নগরমণ্ডলের মধ্যভাগ ভগবান সহস্র রক্ষী অতিক্রম করিয়াছেন,—জগৎ নিস্তদ্ধ, মধ্যো মধ্যো বাসন্তি পক্ষী যুক্তকণ্ঠে কলমিনাদে স্বীয় আনন্দ উপভোগ করিতেছে, সেই সময়ে আব্দুল ভাঁহার বাটীর একটি নিভৃত কক্ষে এক খানি পালকে অর্দ্ধ শয়ান,—অর্দ্ধ উপবিষ্ট,—অনামনস্ক,—করে কপোল অর্পিত ! গৃহে আর কেহ নাই !—এক এক বার মুখের আকৃতি অপেক্ষাকৃত স্নান হইতেছে !—একজন পরিচারক গৃহে প্রবেশ করিল, আগন্তুক আব্দুলকে অভিবাদন করিয়া সবিনয়ে

বলিলেন,—“মহম্মদ আসিয়াছেন ?—” আব্দুল এত অন্যমনস্ক যে আগন্তুকের কথা তাঁহার কণে স্থান পাইল না । আগন্তুক পুনরায় বলিলেন “মহম্মদ আসিয়াছেন !”—এবারও আব্দুল শুনিতে পাইলেন না । আগন্তুক বিস্মিতভাবে অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—“মহম্মদ সাহেব দ্বারে!” আব্দুল চমৎকৃত ভাবে আগন্তুকের মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন, “মহম্মদ আসিয়াছেন,—পাঠাইয়া দেও !”—আব্দুলের কথায় আগন্তুক “যথা অনুমতি” বলিয়া মস্তক নত করিয়া চলিয়া গেল, ক্ষণপরে দীর্ঘ শ্মশ্রু বিরাজিত আর এক ব্যক্তি আসিয়া আব্দুলকে অভিবাদন করিল, আব্দুল আগন্তুককে সম্বোধে বসাইলেন ।—আগন্তুক নম্রভাবে বলিলেন,—“গোলামকে কি জন্য ডাকিয়াছেন ?” আব্দুল আগন্তুককে সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,—“মহম্মদ তুমি চিরকাল আমার কার্য সম্বন্ধে সম্পাদন কর, তজ্জন্য আমি আজীবন তোমার নিকট ঋণী !” আগন্তুক কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন,—“দাসকে ও কথা বলা অন্যায়, এ দাসের দ্বারা আপনার যদি কোন কার্য সম্পাদন হয় তাহা হইলে আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিবে ।” “তজ্জন্যই তো তোমাকে আহ্বান করিয়াছি,—আজ তোমাকে যে কার্য করিতে বলিব,—তাহা আর কাহাকেও বলিবার নহে !”—আব্দুলের কথায় মহম্মদ বলিলেন,—“যাহা আজ্ঞা করিবেন দাস অকুণ্ঠিত ভাবে সাহসাদে গ্রাণপণে সাধন করিতে চেষ্টা করিবে।”—আব্দুল আগন্তুকের অবয়ব সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া মুহূর্ত্তে বলিলেন,—“মহম্মদ, আজ সন্ধ্যার পর একখানি দ্রুতগামী তরী জতি সাবধানে গুপ্তভাবে রাজবাটীর পশ্চাতের উপবনে রাখাইয়া তুমি অলক্ষিত ভাবে রাজবাটীর পশ্চাতের উপবনের যটকোন লতামণ্ডপে উপস্থিত থাকিবে—তথায় আমার



নামাক্কির এই অঙ্গুরীয় তোমাকে যিনি দেবাইবেম, তাঁহাকে নোকাম তাহার অনুমতি মতে জানে লইয়া যাইও!—কিন্তু একথা যেন কোন মতে প্রকাশ না হয়!—আগন্তুক মন্তব্যে বলিলেন,—“দাসের জীবন যাইলেও একথা প্রকাশ হইবেক না,—আপনার ক্রীচরণের আশীর্বাদে দাস আজ্ঞামস্ত কার্য্য বিনাবাধায় সম্পাদন করিবে।”—“তবে এই বেলা কার্য্যসাধনের উদ্যোগ করগে,—কিন্তু দেখ কোন মতে যেন একথা নোকাম নাবিকেরাও না বুঝিতে পারে, তাহারা যেন এ দেশী না হয়, তাহারা যেন কোন সন্দেহ না করে!” আবচ্ছলের কথায় আগন্তুক কহিলেন,—“তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই, তবে এক্ষণে নোকামাত্রই অত্যন্ত সতর্কের সহিত প্রহরির অনুসন্ধান করিতেছে,” আবচ্ছল আগন্তুকের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—“তজ্জন্য চিন্তা নাই,—এই যে নিদর্শন পত্র দ্বিতেছি, ইহা নাবিকদিগের নিকট দিও, তাহারা যত গোপনেপারে, থাকিতে চেষ্টা করিবে, যদি তাহাতেও কোন প্রহরি জানিতে পারিয়া আপত্য করে, ইহা দেখাইলেই আর কোন কথা কহিবে না। আর তোমাকে তো প্রহরির সকলেই জানে,—তুমি তাহাদের অজ্ঞাতে উপরনে প্রবেশ করিবে, কিন্তু তথাপি যদি কোন প্রহরি দেখিয়া আপত্য করে,—তুমি এই নিদর্শন পত্র খানি দেখাইয়া বলিও,—নবাব সাহেব অস্ত্র আমাকে গোপনভাবে রাকপুরি রক্ষার ভার দিয়াছেন,”—আবচ্ছল এই রূপ বলিয়া মহম্মদের হস্তে ছই খানি নিদর্শন পত্র দিলেন। মহম্মদ অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

আবচ্ছল মহম্মদের গমন পর্যন্ত তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন, আগন্তুক দৃষ্টিপথ আভ্যন্তর করিল। আবচ্ছল পুনরায় কপোলে হস্তার্পণ করিলেন। ক্ষণ বিলম্বে মৃদু

স্বরে বলিলেন,—“এলাহি,—আবদুল তেঁহার আজ্ঞা পালন করিল, তোমার আজ্ঞা পালনের জন্য এ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জন করিতে উদ্যত। তুরাআ আমেদের অনেক হিত করিয়াছি, তাহার কার্যের জন্য জীবন নাশের আশঙ্কায় জলাঞ্জলি দিয়াছি,—কৃতজ্ঞ আমার প্রতি যেকপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতেও বিরক্ত হইতাম না, কিন্তু তোমার কথায় কোন কার্যই অকর্তব্য বোধ করি না, নবাব যখন তোমার উপর কুব্যবহার করিয়াছে, তখন তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেও কুণ্ঠিত হইব না। আমার অন্তর তোমার প্রণয়ের আশায় হতাশাস হইয়াছিল,—কিন্তু সেই বালককালের প্রণয় কখনই ভুলিতে পারে নাই, তোমার অমঙ্গল এ দেহে প্রাণ থাকিতে ঘটিবে না,—তোমার জন্য সকল ক্রেশই সুখ জ্ঞান করিব।”—আবদুল নিস্তব্ধ—রুদয় অস্থির! মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—“যে কার্য্যে লিপ্ত হইলাম, ইহাতে সৈন্যগণ যাহাতে আমার অমতে কার্য্য না করে, তাহার চেষ্টা আবশ্যক। আমার অধীনস্থ সৈন্যগণকে আমি যাহা বলিব, তাহা করিবে—বোধ হয়!—কিন্তু মামুদ সাহ আমার বিপক্ষ হইলে অন্য উপায় নাই! মামুদ চিরকালই আমার বন্ধু,—তিনি কি আমার বিপক্ষ হইবেন? আমার অমুরোধ রক্ষা করিবেন না? তিনিও আমেদের উপর বিরক্ত, যেকপ ভাব দেখিয়াছি, তাহাতে যে আমার বিপক্ষ হইবেন,—বোধ হয় না। তাঁহার আসিবার কথা ছিল, কৈ এখনও তো আসিলেন না? নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কি এখনও যান নাই?”—এই সময়ে এক জন দাস আসিয়া অভিবাদন করিয়া, মামুদের আগমন বার্তা জ্ঞাপন করাইল। আবদুল, মামুদ আসিয়াছেন শুনিয়া সম্বাস্তে তাহাকে আসিতে বলিলেন। দাস চলিয়া গেল, ক্ষণ-

বিলম্বে সামুদ গৃহ প্রবেশ করিলে আবহুল সাকরে বসুন্ধর্যাবে উপবেশন করাইয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“নবাবের সহিত কি সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল?” সামুদের মুখের বিবর্ণ, সহসা ক্ষেপিত হই বোধ হয়,—সামুদ রাগত,—বিশেষ কোন কারণে সাক্ষাৎ চিন্তিত! তিনি আবহুলের প্রশ্নে উত্তর করিলেন,—“হাঁ, গিয়াছিলাম!”—আবহুল সামুদের ভাবে ও কথায় স্পষ্ট বুঝিলেন,—নবাব সামুদের সহিত সদ্ভাবহার করেন নাই,—অন্তরে কিছু আত্মদ্রোহিত হইলেন,—পুনরায় সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কি কথা হইল? দস্যুর বিচার সম্বন্ধে বা আমাদের সম্বন্ধে কোন কথা হইয়াছিল?”—সামুদ স্তম্ভিত, নবাবের সহিত যাহা কথোপকথন হইয়াছে, তাহাই বলিতে আসিয়াছেন,—অথচ বাক্যস্থ সহসা সে কথা উচ্চারণ করিতে চাহে না, তাঁহার হৃদয় যে চিন্তায় আবহুল হইয়াছিল, সেই চিন্তাই তাঁহাকে স্তম্ভিত করিল! আবহুলের আগ্রহ আরও বৃদ্ধি হইল,—সেই আগ্রহ ভাবে বলিলেন,—“আমার নিকট বলিতে কি কোন প্রজিবন্ধক আছে?” সামুদ আর নিস্তক থাকিয়া পারিলেন না,—আবহুলের কথাটা তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিল! দুঃখিত ভাবে বলিলেন,—“অন্যদিকে আমার এমন কিছুই নাই, যাহা কোমার নিকট গোপন রাখি,—আবহুল,—তাই, তুমি কি মনে কর,—কোমার নিকট আমার কিছু গোপন করিবার আছে?”—আবহুল সামুদের কথার বাধা দিয়া আগ্রহের ভাবে বলিলেন,—“যদি তাহাই মনে করিব,—তবে জিজ্ঞাসা করিব কেন?—আমার মন দুর্বল চিন্তায় জাহির; সুতরাংই এক্ষণে কথা বলিয়াছি,—যদি”—সামুদ আবহুলের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—“ও কথা বাক—কদা নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়ার তিনি

অন্য দিনের মত ভাব প্রকাশ করিলেন না,—সকল কথাই বিরক্তি-সূচক, সকল কথাই সন্দেহ-বাজক। দস্যুর বিচার সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করায়, বিরক্ত ভাবে বলিলেন,—তাঁহার বিচার আর কি,—যাহাতে ক্রমে ক্রমে প্রাণ খিনষ্ট হয়, তাহাই কর্তব্য!—আমি তাহাতে বলিলাম,—আপনি বিবেচনা করুন, আমাদের মতান্তর কথা! কিন্তু আবদুল সাহেবের ইচ্ছা,—বিশেষ বিবেচনা করিয়া দস্যুপতির দণ্ডবিধান হয়, কনকনের প্রজাগণের মধ্যে যাহাতে দস্যুগণের অত্যাচার আর না হয়, তাহাই তাঁহার উদ্দেশ্য,—তোমার নাম শুনিয়া নবাব আরও বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—আবদুলের সে উদ্দেশ্য নহে,—এলাহিজানের অনুরোধ রক্ষাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এ বিচার তো হইয়াই আছে, তৎসহ এলাহিজানের ও আবদুলের ব্যতিচার দোষের বিচার হইবে!”—আমার সহ হইল না, আমি বলিলাম,—আবদুলের প্রতি একপ সন্দেহ অন্যায়, বিশেষ প্রমাণ না পাইলে একপ সন্দেহ করিতে নাই,—কেবল মাত্র এই কয়েকটি কথা বলিয়াছি,—নবাব কোপে অস্তির ভাবে বলিলেন,—“আমি বুঝিয়াছি,—তুমিও আবদুলের কুহকে মোহিত, আমি তোমার কথা শুনিতে চাহি না,—কহারও পরামর্শে আমি কাষ করি না,”—আমি দেখিলাম, নবাবের চরমকাল উপস্থিত,—কোন হিত কথাই তাঁহার ভাল লাগে না,—সুতরাং অন্তরের ভাব অন্তরে রাখিয়া বিনিত ভাবে বলিলাম,—আপনার যাহা মত, তাহাই আমাদিগের শিরোধার্য্য, আপনি বলিবার অধিকার দিয়াছেন—বলিয়া বলি,—আবদুল একজন সামান্য লোক নহে, তাঁহার উপর সন্দেহ করিতে হইলে বিশেষ প্রমাণ আবশ্যক—নবাব আমার কথায় বাধা দিয়া তাহুলা হাস্যে বলিলেন,—তবে কি আমার আবদুলের ভয়

করিতে হইবে” —আমি হেঁদেছিলাম,—আর অধিক কথা  
 কহিলে অনিষ্ট তিন্ন হইবে” সস্তাবনা নাই, সুতরাং  
 নবাবকে—“আপনার যাহা অভিলাষ করিবেন,  
 আমরা আপনার আজ্ঞাকারী দাস” —বলিয়া অভিবা দন  
 করিয়াই বিদায় হইলাম,—তিনি আর কোন কথা কহিলেন  
 না, মুখে ভয়ানক ক্রোধ ও বিরক্তি চিহ্ন প্রকাশিত হইল।—  
 আমি দেখিয়া বিবেচনা করিয়াছি,—নবাবের চূর্ণ, দ্বি ঘটি-  
 যাচ্ছে” —আবদুল মামুদের কথা গভীর ভাবে শ্রুতিতে-  
 ছিলেন,—মধ্যে মধ্যে অধৈর্য হইয়া বাধা দিবার উপক্রম করি-  
 য়াই তাড়াত্তে নিরস্ত হইয়া মুখাকৃতিতে সেই ভাব অম্পর্ক  
 প্রকাশ করিতেছিলেন। আঁকার ইঙ্গিত চক্ষুঃ ও মুখে মানসিক  
 ভাব প্রকাশ পায়, নীতি-শাস্ত্রের এমন অখণ্ডনীয়! যতই কেন  
 ধৈর্য্যাবলম্বী হউক না, মানসিক ভাব কখনই গোপন রাখিতে  
 পারে না, আবদুল বিধিযতে মানসিক ভাব গোপন নাগিতে  
 চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মুখশ্রী অম্পর্ক জানাইতে  
 চেষ্টা করিতেছে! আবদুল দুর্গম ভাবে বলিলেন,—“নবাব  
 যদি আমাকে ঘোষী বিবেচনা করেন, কি করিব? আমার  
 সাপক্ষে নবাবের বিপক্ষই বা কে হইবে?” —মামুদ আবদুলের  
 কথায় বাধা দিয়া গভীর রাগ প্রকাশক স্বরে বলিলেন,—  
 “তোমার বিপক্ষই বা কে হইবে? —কনকন কি কৃতস্নেহ পরিপূর্ণ  
 তোমার স্বারা কনকন বারিগণের বে উপকার হইয়াছে —  
 সুরাপায়ী বিলাসী নবাবের স্বারা তাহা কি কখন হইবে? সে  
 সকল উপকারই কি কনকনবাসিগণের স্মৃতিশক্তি দূরে  
 যাইবে? —আর—আবদুল—তোমার অভিলাষ না নবাবের!—  
 আমি কি না জানি? বলিতে কি—এলাহিআন তো তোমারই  
 পত্নী, যদি জাতি-বিবাদ না হইত তবে কি তোমাদের বিবাহের

কোন ব্যতিক্রম ঘটিল?"—আবদুল ছুঃখিত ভাবে তত্বতরে বলিলেন,—“নবাবের বিপক্ষে আমার পক্ষ হইবে,— তাহাই বা কেনন করিয়া বিশ্বাস করিব? মামুদ,—কনকনে তোমার ন্যায় আত্মীয় আমার আর কে আছে,”—আবদুলের ছুঃখশ্রোতঃ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইল,—জিহ্বার জড়তা হইল!—

“ভাই কখন মনের কথা কি আর কাহাকেও বলিয়াছি তুমি বাতিল, আমার আর ছুঃখের অংশী কেহ নাই, কিন্তু বিবেচনা করিয়া বল দেখি,—তুমিই কি আমার পক্ষ অবলম্বন করিতে পারিবে?—তুমি কি নবাবের পক্ষ গুরুতর বোধ করিবে না?”—মামুদ ছুঃখ ক্রোধ ও বিরক্তি সূচক স্বরে বলিলেন,—“কি ছুরাছুরা নবাবের অনুরোধ!—তোমার বিপক্ষ,— জাতে বন্ধুর—অকৃত্রিম বন্ধুর বিপক্ষ, বল না,—এখন নবাবের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিতেছি, তাহাকে অচিরে ভূগর্ভে নিহিত করিতেছি!”—আবদুলের সেই ছুঃখ-ভরা-ক্রান্ত মুখ চৰ্বে উৎসাহে পরিণত হইল।—“ভাই, তবে আমার ভয় কি?—কনকনে তুমি যদি আমার পক্ষ থাক, নবাবকে আমি লক্ষ্য করি না,”—মামুদ আবদুলের কথায় বাদী দিয়া সেই ক্রোধ কম্পিত স্বরে বলিলেন,—“যদি পক্ষ থাক, সন্দেহ—আমি তোমার কখন বিপক্ষ হইব, ইহাও কি মনে হইয়াছে?”—আবদুল—“ছুঃসময় বলিয়া বলি!”—মামুদ সেই গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—“বন্ধুর আবার সময় অসময়?—ছুঃসময়ে যে বন্ধুতা রাখে না সে কি অকৃত্রিম বন্ধু?—বিপদেইতো বন্ধুতা!”

হতা! । ————— সমস্তানি, —এলা! দুই ।

“ আরম্ভঃ সংশয়াণামবিময়-ভবনং পশুনং মহসানিৎ  
 দোষাণাং সম্মিধানং কলটশতময়ং ক্ষেত্রমপ্রত্যয়ানাং  
 তৃত্যাজং যজ্ঞহস্তিঃ সুরনর-বৃষভৈঃ সৰ্বমায়া-করণং  
 স্ত্রীকপং কেন লোকে বিষমমৃতময়ং ধর্মানাশায় সৃষ্টং ? ”

রণজয় কারাগারে,—ভেজীয়ান বন্দী, লৌহ-শৃঙ্খল বন্ধ,—  
 গৃহ-নিবৃত্ত, ছারবুজ । একটি ছীন জ্যোতি দীপ স্থানভায়ে  
 আলিতেছে, রণজয় এখন আর সে রূপ পীড়িত নয়, তাঁহার ক্ষু-  
 হ্রান যদিও সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই, কিন্তু শরীর তাদৃশ অসু-  
 নহে, দুই-দিন হইতে গজাকিষণ প্রদত্ত কিছু কিছু আহার  
 করিতেছেন, কেন?—তাহা তাঁহার অন্তর বলিতে পারে ।  
 বীরপুরুষের হৃদয় কি সহজে আত্মহত্যা করিতে চায়? তবে যে  
 রণজয় বলিয়াছিলেন,—জীবন থাকিতে মহারাষ্ট্রীয় কারাগারে  
 যাইবে না?—মৃত্যু কি যুদ্ধের কথা, নিয়তি যে স্বীকার না  
 করে করুক, আমি প্রত্যেক স্থলেই দেখিয়াছি,—নিয়তি দীপ্ত-  
 বতী! পতিপ্রাণা সীতা কি বনে প্রাণত্যাগ করিতে পারিয়া  
 ছিলেন? কেবল নিয়তি তাঁহাকে মরিতে দেয় নাই! চিকিৎ-  
 সক বারণ করিতেছেন,—তুমি এরূপ ব্যাহার করিওনা,—  
 পরিচারক আত্মীয় গুরুজন পিতৃমাতা বারণ করিতেছেন,—  
 একপ করিলে অকালে কালগ্রাসে পড়িবে,—দিনকতক কট-  
 কর,—কিন্তু নিয়তি কি তাহা শুনিতে দেয়? যে চিরকাল  
 বুদ্ধিমান বলিয়া খ্যাত, সে নিয়তি চক্রে নিকোষ রূপে প্রতিপন্ন  
 হইতেছে। ঐ অমুক ডাক্তার পুত্রশোকে আত্মহত্যা হইলেন,—

কে না পুঞ্জশোক পায়? তিনি তো ডাক্তার,—নিতাই কত দুর্ভাগ্যের পুঞ্জশোকে হৃদয় মথিত হইতে দেখিয়াছেন, কত লোককে জ্ঞান দিয়াছেন; অনেকে বলিবে সে নিরর্থক,—আমার মতে তিনি নিরর্থক নহে, নিরতি তাঁহাকে আশ্রয় করাইল,—তাঁহার অপরূপ কি!—রণজয়ের কারাগারে নিয়তি মৃত্যুকবলে দিবে না,—সুতরাংই তিনি ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছেন, যদি মানসিক কিছু ক্ষুধা পাইতেন, এতদিন পূর্বমত সবল হইতেন!—সেই নিয়তি চক্রেই কি রণজয় বহিঃস্থ প্রবর্তেচ্ছ পতঙ্গের ন্যায় কনকনে প্রবেশ করিয়াছিলেন?—রণজয়কে কি বধা ভূমিতে উপহার দিবার জন্য নিয়তি রাখিয়াছে? কে জানে? নিয়তি ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত,—শেষ না হইলে কে বুঝিবে, কে বলিবে?

যাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত, জগৎ নিশ্চল, সকলেই নিদ্রায় আচ্ছন্ন, কিন্তু রণজয়ের নিদ্রা নাই! নিদ্রাদেবী সকলকে আক্রমণ করিতে পারেন, কিন্তু চিন্তাশীলকে ভয় করেন! রণজয় সেই গভীর রাত্রে চুশ্চিন্তায় মগ্ন, তাঁহার জীবনের আশা ফুরাইয়াছে, তথাপি আশা এক এক বার তাঁহার মোহিনী ছায়া দেখাইতেছে!—সকল আশা, ভগতের সকল কার্য,—সকল ভরসা, শেষ হইয়াছে, তথাপি চিন্তার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি নাই! কুসুমিকার প্রণয়-সংজ্ঞিত অমিষ্ট চিন্তা উচ্ছলিত ভাবে অনিবার্য্য রূপে ভোগ করিতেছেন,—হৃদয় দক্ক হইতেছে।

রণজয়ের নানা চিন্তা,—ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্ন চিন্তা! চিন্তা-সহ তর্ক,—একবার ভাবিতেছেন,—আমাকে আমেদ জীবিত রাখিয়াছেন কেন?—জীবন অন্তর হউক, আমার রক্তে বধা-ভূমি রঞ্জিত হউক,—অকাভরে সমুদয় চিত্তে প্রস্তুত, কিন্তু আর



বিলম্ব সহে না!—যবনের অনেক ভাব কি? আবছুলই বা কেন আমাকে এত যত্ন করিতেছেন?—তিনি বলিলেন,—নবাবের কোপ ভোগার উপর অত্যন্ত, নচেৎ তুমি তাঁহার বেগমকে অগ্নি হইতে উদ্ধার করার পুরস্কারের স্বরূপ নিষ্কৃতি পাইবার উপযুক্ত!—নবাব যদিও কৃতঘ্ন, কিন্তু তুমি যাকাকে উদ্ধার করিয়াছ, তিনি কৃতঘ্ন নহে,—তুমি হতশ্রম হইও না!—এ কথার ভাব কি,—তঁারই জন্যতো আমি প্রকৃত কারাবাসীর ন্যায় নহে,—গঙ্গাকিষণ হিন্দু, তাঁহার দ্বারা কোন গতে আমার কিছু আহাব দেওয়া, এওতো আমার জীবন রক্ষার চেষ্টা,—হাকিমজিউ বা এঁতো যত্নে আমার জীবন রক্ষা করিলেন কেন? তাঁহাকে জিজ্ঞাসায় তিনি বলিলেন,—নবাব তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছে!—নবাবের কি ইচ্ছা?—আজ্ঞে নিষ্ঠুর, আমার উপর তাঁহার ভয়ানক ক্রোধ,—তবে কি—সুবর্ণ-দুর্গ আক্রমণ করিয়া আমাকে দেখাইয়া পরে বধ্যভূমিতে উপহার দিবে?—কুমিকাকে বন্দিনী করিয়া কি আমাকে দেখাইবে?—এই সকল চিন্তার অনবসানে গৃহদ্বার যত্ন হইল, দ্বারে দৃষ্টিপাত করিলেন,—দেখিলেন,—একটি সুন্দরী বহু মূল্য বেশ-ভূষিতা রমণী! তিনি আশ্চর্য্যাম্বিত! রমণীটি ক্রমশঃ রণজয়ের নিকট আগমন করিল!—রমণীটি মৃত্যুরে রণজয়কে প্রণাম করিল?—“চিনিতে পারেন?” রণজয় চিন্তা করিয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন,—“না!” আমাকে আপনি নবাবের অন্তঃপুরের অগ্নিকুণ্ড হইতে রক্ষা করিয়াছেন, আপনি আমার জীবন দাতা—রণজয় রমণীর কথায় বাধা দিয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন,—“আমি কর্তব্য কর্ম করিয়াছি,”—“হাঁ,—বটে এ মহৎকৃত্যের চিত্র!”—বলিয়া আগন্তুক রমণী এক খামি লৌহ কর্তুরি রণজয়ের হস্তে দিয়া বলিলেন,—

“পদদ্বয়ের বন্ধন শীঘ্র ছেদন করুন, এক্ষণে অন্য কথার আন্দোলনে সময় ক্ষেপের আবশ্যকতা নাই!” রণজয় নিশ্চিত ভাবে রমণীর মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—“আপনার এ অসম সাহস কেন?”—রমণী স্মিত মুখে বলিলেন,—“কৃত জ্ঞতা,—শীঘ্র কার্য সম্পাদন করুন!”—রণজয় মনে মনে ভাবিলেন,—যাহাই হউক,—বন্ধন ছেদনে ক্ষতি কি? তিনি ত্বরিত হস্তে পদদ্বয়ের লৌহ-শৃঙ্খল কর্তন করিলেন। রমণী দেখিলেন—রণজয় বন্ধন মুক্ত,—পরিচ্ছদের ভিতর হইতে এক খানি শাগিত খজা ও একটি নপুংসকের পরিচ্ছদ রণজয়ের হস্তে দিয়া বলিলেন,—“এই পরিচ্ছদটি পরিধান করিয়া শীঘ্রই আমার সঙ্গে আসুন!”—রণজয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কোথায় যাইতে হইবে?”—

। “জানিতে পারিবেন,—এ নরকে আপনার ন্যায় দেব পুরুষের আবাসের স্থান নয়!”—রণজয় রমণীর কথায় আর দ্বিধা করিলেন না, ভাবিলেন,—বস্তুতঃই এ নরক হইতে যেখানে যাওয়া যাইবে সেই আমার সুখের স্থান! তিনি শীঘ্র পরিচ্ছদটি পরিধান করিলেন,—রমণী রণজয়কে সেই পরিচ্ছদে আবৃত দেখিয়া ব্যস্ততার সহিত বলিলেন,—“শীঘ্র আসুন, আমি বলিলে অন্ত্র বাহির করিবেন, এক্ষণে গোপনে রাখুন”।—রমণী গৃহ হইতে নির্গত হইলেন, কারাগৃহের দ্বারে দুই জন প্রহরি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। কোন কথা কহিল না,—কহিবার ক্ষমতাও নাই! গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া রমণী গৃহের দ্বার পূর্বমত রুদ্ধ করিলেন,—রণজয় রণজয়কে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরের পথে চলিলেন অন্তঃপুরের দ্বারে একজন নপুংসক প্রহরি জিজ্ঞাসা করিল,—“কেও?”—রমণী একখানি অভিজ্ঞান

পত্র দেখাইবা মাত্র সে সসম্মুখে অভিমান করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল ! আর ছুই এক জন প্রহরিও ঐ রূপ নির্বাক হইল । রমণী একটি গৃহ প্রবেশ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—  
 “আমি সকল স্থির করিয়া আসিয়াছি,—আমের পার্শ্বের গৃহে নিদ্রিত,—সুরার মোহিনী মায়াবজ্ঞান, অজ্ঞান নিদ্রিত। এই সময়ে নিঃশকুচিত্তে আপনার শত্রুকে বিনাশ করিয়া সমুদ্র-যাত্রা করুন।—সময় আর বিনষ্ট না হয়, তারি প্রস্তুত।—  
 “রণজয় রমণীর কথা শুনিয়া বিস্মিত,—দ্বিগুণভর সংশয়ে মগ্ন ! ক্ষণ বিলম্বে বলিলেন, আমি মহারাষ্ট্রীয়,—বীর নাম ধারণ করিতে ইচ্ছা করি,—বীর নাম লইয়া বধ্যভূমিতে হত হইলেও আহ্লাদে মরিব ! একশ কার্য্য আমার দ্বারা হইবে না, আমা-  
 দেয় ধর্ম্মে একর্ম্ম অতিশয় নিন্দনীয়।”—রমণী কিছু বিরক্ত-  
 ভাবে বলিলেন,—“শত্রু নাশে,—আপনার জীবন রক্ষায় ও সকল বিবেচনার সময় নহে,—পশুর ন্যায় স্বরক্তে বধ্যভূমি রঞ্জিত করা কি বীরধর্ম্ম ?” রণজয় উচ্ছ্বসে বলিলেন,—  
 “নিদ্রিত শত্রু বধ্যপেক্ষা তাহা সহস্রাংশে শ্রেয়স্কর ! আপনি যতই কেন বলুন না,—আপনার এরূপ কূটজ্ঞতার যথেষ্ট বাধা হইলাম ! আপনার কথা রক্ষা করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইলাম !—ইহাও বলি,—আমাকে একপ মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে আপনি বিপদে পড়িবেন।”—রমণী বিরক্তিভাবে হাসিয়া বলিলেন,—“সে বিপদ আমি পূর্বেই জানি, তাহা না হয় তদ্বিষয়ের উপায়ও করিয়াছি ! দেখিতেছেন না, আপনার কারাগৃহের প্রহরীরা অজ্ঞান !—সে বিবেচনা আমার আছে, আপনার ন্যায় সহজে মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইতে আমি ইচ্ছুক নহি ! কিন্তু আপনি যদি একপ কার্য্য না করিতে পারিবেন,—  
 তবে হুজুর জেদন করিলেন কেন ?—আমার সঙ্গে আসিলেন

কেন ?—“রণজয় অপ্রতিভভাবে বলিলেন,—“পূর্বে জানিলে হইত না,—আর এক লাভ,—মৃত্যুকালে দুই এক জন শত্রু সংহার করিতে পারিব!—আর যদি বলেন, আমি পুন্মরায় কারাগৃহে ঘাইতে প্রস্তুত।”—রমণী ক্ষণকাল কোন উত্তর করিলেন না,—ক্ষণপরে বলিলেন,—“ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন,—আমি শীঘ্র আসিতেছি,—অস্থখানি দিন! বৃথা অনেক সময় নষ্ট হইল।” রণজয় বিনা উত্তরে তাঁহার প্রদত্ত খস্ম তাঁহাকে দিলেন। রমণী হুহু হইতে শীঘ্র পদে বহির্গত হইলেন!—রণজয় ভাবিলেন,—দেখি, রমণী কি করে। তিনি দেখিলেন পাশ্চাত্যী একটি গৃহে রমণী প্রবেশ করিলেন,—সেই গৃহে আমেদশাহী সুলতান, রমণী পালকে উঠিয়া আবার কি ভাবিয়া নাহিলেন! তাঁহার জলদ কুটির কুন্তল-বেণী খুলিয়া মুখো-পরিসংস্থাপন করিলেন,—শীঘ্র পদে পালকে উঠিয়া আমেদেব বক্ষঃস্থলে উপবেশন করিয়া শীঘ্র হস্তে তাঁহার কণ্ঠদেশে সূতীক্স অস্ত্র বসাইয়া দিলেন, আমেদ বিকৃত দৃষ্টিতে রমণীকে দেখিলেন, ভয়ানক বাতলা ব্যঞ্জক শব্দে বলিলেন,—“সয়তানি, —এলা—তুই”

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ।

উদ্ধার । ———— অস্বস্ত কুন্তজহা

“—————দেবী বিচিত্রা গতি।”

রণজয় স্তম্ভিত, যাঁহার তরবারি পরিচ্ছদ রণক্ষেত্রে নর-শোণিত-সিক্ত হইলে হৃদয় কখন বিকৃত হইত না, সেই রণজয় অদ্য শীহরিয়া উঠিলেন, শরীর কটকিত হইল,—

“এ কি?—কৃতজ্ঞতা!” হৃদয় স্বতঃ বারংবার প্রশ্ন করিল,—  
 উত্তর কে করে? এলাহিজান কৃতপদে আমেদ সাহের গৃহ  
 হইতে বহির্গত হইয়া রণজয়ের হস্তে একখানি তরবারি দিয়া  
 ভয়-বিকৃত স্বরে বলিলেন,—“আমার সঙ্গে আইস!” রণজয়  
 কোন উত্তর করিলেন না, কেন?—তাহা তাঁহার হৃদয় বলিতে  
 পারে; এলাহিজান রণজয়ের মুখে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া  
 অস্পষ্ট ক্রোধ-জনিত উপহাস সূচক স্বরে বলিলেন,—“পথে  
 কেহ প্রতিবন্ধক হইলে বীরের—হিন্দু-বীরের—কার্য্য করিতে  
 পারিবে তো? রণজয় তাক্কল্য ভাবে বলিলেন,—“মহা-  
 রাষ্ট্রীয়ের হস্তের অসি শত শত্রুর শোণিত-সিক্ত না হইলে  
 কেহ পথরোধে কৃত কার্য্য হইতে পারে না!”—এলাহিজান  
 কোন কথা না বলিয়া দ্বিতল হইতে একটি দোপান দিয়া  
 অবতরণ করিতে লাগিলেন, এক জন প্রহরি জিজ্ঞাসা করিল,  
 —“কেও?”—এলাহিজান রণজয়ের গাত্র স্পর্শ করিয়া  
 লঙ্কেত করিয়াই তাঁহার পশ্চাতে গেলেন। রণজয় গভীর  
 শব্দে বলিলেন,—“জানিবার আবশ্যকতা নাই!” প্রহরি  
 উত্তর করিল,—“রাত্রে নবাব সাহেবেবরুও এ পথে বিনা পরি-  
 চয়ে যাইবার অধিকার নাই!”—এলাহিজান বিরক্ত মুদ্রায়  
 রণজয়ের কর্ণে বলিলেন,—“শত্রু বীরতা দেখাও, সময় নষ্ট  
 করিও না! রণজয় গভীর ভাবে—“তবে পথ রক্ষা কর,”—  
 বলিয়াই অসি নিক্ষেপিত করতঃ প্রহরিকে লক্ষ্য করিলেন।  
 প্রহরি নিম্নে, এতক্ষণ ভাবিতেছিল,—কেহ উপহাস করি-  
 তেছে, এখন স্থির করিল, শত্রু!—আর অপেক্ষা না করিয়া  
 অসি উঠাইবামাত্র রণজয়ের অসির তীব্র আঘাতে “শত্রু”-  
 শব্দ উচ্চারণ করিয়াই ভূতলশায়ী হইল। এলাহিজান রণ-  
 জয়কে কৃতপদে যাইতে বলিলেন, উভয়েই কৃতপদে

প্রাসাদের উপবনে প্রবেশ করিলেন, এলাহিজান সমুদ্রস্থ স্তম্ভ লতামণ্ডপের সম্মিহিত হইয়া মুহূর্ত্তেরে বলিলেন,—  
“উপস্থিত!” লতামণ্ডপ হইতে একজন সৈনিক বহির্গত হইয়া উভয়কে দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—  
“অভিজ্ঞান আছে?”—এলাহিজান একটি অঙ্গুরি তাঁহার হস্তে দিলেন, সে অঙ্গুরি লইয়া অনতিদূরে একটি দীপের আলোকে আপনার হস্তস্থ অঙ্গুরীরের সহিত মিলাইয়া দেখিলেন,—পরে বলিলেন,—“আমার সঙ্গে আসুন।”—

এলাহিজান,—“কোন পথ দিয়া যাইবেন?”

সৈনিক,—“পশ্চিমের ক্ষুদ্র দ্বারে।”

এলাহিজান,—“তথায় তো প্রহরি আছে? যদি আমাদের দেখিয়া সন্দেহ করে?”—

সৈনিক না উত্তর করিতে করিতে রণজয় প্রতীক ভাবে বলিলেন,—“হস্তে অগ্নি আছে।”

সৈনিক ক্ষণেক চিন্তা করিয়া উত্তর করিল,—“আমার নিকট নিদর্শন পত্র আছে,—কিন্তু আপনাদের দেখিয়া কতক সন্দেহ করিতে পারে, অথচ সকল দ্বারেই তো প্রহরি,—অর্থক আত্মীয় হত্যায়ও আমার প্রভুর স্পষ্ট অনুমতি নাই—”  
এলাহিজান সৈনিকের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—“আমার বিবেচনায় সমুদ্রের নিকটস্থ গোপন দ্বার দিয়া যাওয়াই উচিত, তাহার চাবিও আমার নিকট আছে।”—সৈনিক সন্দেহ ভাবে বলিলেন, “সেই—ভাল!—আমি সে পথ জানি না,—আপনি তবে অগ্রসর হউন?”—এলাহিজান অগ্র-গামিনী, রণজয় ও সৈনিক পশ্চাতে! গুপ্ত দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া এলাহিজান দ্বার উদ্বাটন করিলেন, সকলে বিনা বাধায় দ্রুতগদে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন। সৈনিক উভয়কে এক খানি সূন-জিহত তরীতে লইয়া গেলেন, সকলে তাহাতে আরোহণ করিলে সৈনিক বলিলেন,—“কোথায় লইয়া যাইতে হইবে?”  
রণজয় উত্তর করিলেন,—“সুবর্ণ দুর্গে।” সৈনিক অঙ্গ চিন্তা করিয়া নাবিকদিগকে তরি সুবর্ণ দুর্গে লইয়া যাইতে অনুমতি

য়া অবতরণ করিলেন! দ্রুতবেগে তরি চলিল, বায়ু অনু-  
নত। দেখাইয়া তরিকে আরো দ্রুতগামী করিল।

রণজয় বিস্মৃত, তরির এক পার্শ্বে উপবিষ্ট, কোন কথা  
হি! এলাহিজানের চক্ষুঃ আরক্ত বিস্করিত দৃষ্টি তীব্র!  
তনিও নির্বাক, কখন পাদচারণ করিতেছেন, কখন বা বসি-  
তছেন! অনেকক্ষণ পরে রণজয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—  
‘আমি কোথায় যাইতেছি?’ রণজয় সেই বিস্মৃত ভাবে বলি-  
লেন,—“সুবর্ণ-দুর্গে!” এলাহিজান স্তম্ভিত, ক্ষণবিলম্বে অনু-  
গাপজনিত স্বরে সবিচ্ছেদে বলিলেন,—“সু-ব-র্ণ-দু-র্গে, চ-ল,—  
মনকনে প্রভাতে আর এ মুখ নাই দেখাইলাম!” রণজয়  
এলাহিজানের মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া বিনত ভাবে বলিলেন,—  
‘আমেদ সাহ কি আপনার আত্মীয়?’—এলাহিজান সেই  
ভাবেই বলিলেন,—“আত্মীয়-না—শত্রু,—আত্মীয় হইলে কি  
এরূপ ব্যবহার ঘটে?” “তবে আপনার এরূপ মুগ্ধ হইন  
কেন?” রণজয় এই প্রশ্ন করিয়া কিছু অপ্রতিভ হইলেন, ভেগি-  
লেন,—এলাহিজানের চক্ষুঃ অশ্রু মোচন করিল! এলাহিজান  
ক্ষণ বিলম্বে ভগ্ন কণ্ঠে বলিলেন,—“মুখ-হীন,—সে আত্মীয়  
ভাবিত, আমিও আত্মীয়তা দেখাইতাম, আমি পিলাট,  
আমি সয়তানি,—আমেদ নির্বোধ, সে প্রণয়ে শঠতা মিশায়,  
তাহার কল সে ভোগ করিল, আমি কলঙ্কিনী হইলাম!”—  
রণজয় অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমায় উদ্ধা-  
রের আপনার এত যত্ন কেন?” এলাহিজান গম্ভীর উত্তোজিত  
স্বরে বলিলেন,—“কৃতজ্ঞতা!” রণজয় বিস্মৃত ভাবে তত্বতরে  
বলিলেন,—“অদ্বুত কৃতজ্ঞতা!”—নৌকার প্রতিধ্বনি বলিল,—  
“অদ্বুত কৃতজ্ঞতা!!”

ইতি প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

